৮.০৬ জাভেদ ও নরখাদক – Bangla Library

৮.০৬ জাভেদ ও নরখাদক – Bangla Library

জাভেদ ও নরখাদক –১২৬

থমথমে গভীর রাত।

অগ্নিকুন্ডটা জ্বলে জ্বলে এখন প্রায় নিতে এসেছে।

তারাবিহীন আকাশ জমাট অন্ধকারে ভরা। সমুদ্রের গর্জন আর ঝাপটা হাওয়া মিলে অদ্ভুত একটা শব্দের সৃষ্টি করে চলেছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের দলবল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু জেগে আছে জাভেদ। সে অগ্নিকুন্ডটার পাশে বসে মাঝে মাঝে শুকনো কাঠ দিয়ে নাড়া দিচ্ছিলো আগুনটাকে। পাশে তার প্রিয় তীর-ধনু।

পদশব্দে ফিরে তাকালো জাভেদ।

ফুল্লরা তার পাশে বসে কাঁধে হাত রেখে বলে–জাভেদ, তুমি না অসুস্থ! রাত জাগলে তোমার শরীর আরো খারাপ হবে।

জাভেদ একটু হেসে বললো সবাই ঘুমালে ফের ঐ লোকটা আসবে। উঃ! কি ভয়ংকর লোকটা!

এমনি করে বসে থাকবে তুমি?

হাঁ, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

কিন্তু আমার চোখেও যে ঘুম আসছে না জাভেদ!

ফুল্লরা জাভেদের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো—জাভেদ, তুমি বারবার আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলছে। এমনি করে চলে যাও, আমি কি যে মনকষ্টে কাটাই তুমি তা বুঝবে না।

বললো জাভেদ–আমি তো ইচ্ছা করে যাইনি ফুল্লরা। আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাকে কেউ যেন কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। আমি চেষ্টা করলাম নিজকে মুক্ত করার জন্য কিন্তু পারলাম না। শক্ত দুটো হাত আমার দেহটাকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে আছে।

কি সর্বনাশ! বললো ফুল্লরা দুচোখে বিস্ময় নিয়ে।

জাভেদ বলছে–একবার ভাবলাম আমি বুঝি স্বপ্ন দেখছি কিন্তু পরক্ষণেই আমার হুশ হলো। লোকটা আমার চুলগুলো ধরে একটা সমতল জায়গায় শুইয়ে দিলো, তারপর সে তার বিরাট বিরাট নখ দিয়ে আমার দেহের মাংস তুলে নেবার চেষ্টা করলো।

তারপর, তারপর কি হলোর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো ফুল্লরা।

জাভেদ পূর্বের ন্যায় শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো আমার বুকের কাছে মুখ নিয়ে মাংস তুলে নেবার উপক্রম করতেই আমি তার পেটে প্রচন্ডভাবে লাথি মারলাম।

লোকটা প্রস্তুত ছিলো না, তাই সে ছিটকে পড়লো দূরে। ঐ মুহূর্তে আমি উঠে পড়লাম এবং দ্রুত সরে গেলাম।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ফুল্লরা, বললো সে–তুমি কি তাকে দেখতে পাচ্ছিলে জাভেদ

অন্ধকারে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনি তবে তার চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলছিলো। ঠিক যেন হিংস্র বাঘের চোখ।

তারপর?

ছুটলে ও আবার আমাকে ধরে ফেলতে পারে তাই একটা ঝোঁপের মধ্যে শুয়ে পড়লাম উবু হয়ে। আমি অন্ধকারে কান পেতে আছি,. লোকটার পায়ের শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে। শুকনো পাতার উপর খসখস্ আওয়াজ হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারলাম লোকটা আমার সন্ধানে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। আমি তখন ঝোঁপটার মধ্য হতে উঠে ছুটতে শুরু করলাম, কারণ লোকটা আবার এখানে ফিরে আসতে পারে। নিরস্ত্র না হলে আমি ওকে পাল্টা আক্রমণ করতাম কিন্তু তার ধারালো নখ আর দাঁত…উঃ! কি সাংঘাতিক, কি ভয়ংকর! সমস্ত রাত ধরে ছুটেছি, একসময় ভোর হয়ে এলো, তখন দেখলাম আমি সাগরতীর হতে বহু দূরে চলে এসেছি। শুধু পর্বতমালা আর জঙ্গল। মাটিতে চাপ চাপ্ সোনা। এখানে যেমন মাটির সঙ্গে সোনা মিশে আছে ওখানে তা নয়। বড় সোনার চাপ্…

সত্যি বলছো জাভেদ!

হা সত্যি।

ফুল্লরা নিভু নিভু অগ্নিকুন্ডটার স্বল্প আলোতে জাভেদের দীপ্ত সুন্দর বলিষ্ঠ মুখমন্ডলের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে মাঝে-মধ্যে প্রশ্ন করছিলো। তার অবচেতন মনে আজ নতুন একটা ভাবের সঞ্চার হয়। এমন করে জাভেদকে সে কোনোদিন কথা বলতে শোনেনি। তাকে সব সময় চঞ্চল আর খেয়ালীই দেখেছে ফুল্লরা। সে যে এতো সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে তা সে জানতো না। জাভেদকে নতুন করে যেন আবিষ্কার করে সে আজ।

ফুল্লরা তাকালো আরফিন হুই এবং তার দলবলের দিকে।

সবাই সেই বন্য মানুষটার পেছনে ছুটাছুটি করে বড় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এতে আতংক কষ্টের মধ্যেও অঘোরে ঘুমাচ্ছে সকলে। তারা কম্বলের তলায় কুঁকড়ে আছে শীতের রাতে ডাস্টবীনের পাশে কুকুরগুলোর মত।

লুসিও ঘুমাচ্ছে তার পিতার পাশে।

ফুল্লরার প্রথমে কিছুটা তন্দ্রা এসেছিলো কিন্তু তন্দ্রা ছুটে গেলো যখন সে তাকিয়ে দেখলো জাভেদ বসে আছে অগ্নিকুন্ডটার পাশে। কম্বলটা সজোরে উঠে বসলো, ভালভাবে লক্ষ্য করলো সবাইকে। কেউ জেগে নেই এমন কি ডিরোমাও ঘুমাচ্ছে।

লুসির দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হলো ফুল্লরা, দেখলো অঘোরে ঘুমাচ্ছে সেও। চুলগুলো তার বাতাসে উড়ছে।

ফুল্লরা পা টিপে টিপে জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

জাভেদ কিছু ভাবছে।

পদশব্দে ফিরে তাকাতেই ফুল্লরা তার পাশে বসে পড়েছিলো, প্রথমে ভেবেছিলো জাভেদ তার সঙ্গে কথাই বলবে না হয়তো। কারণ বহুদিন ফুল্লরা বিমুখ হয়ে ওর কাছে গিয়ে, একটি কথাও জাভেদ বলেনি, আর আজ এতোগুলো কথা বললো জাভেদ, সত্যি বড় আনন্দ লাগছে ফুল্লরার।

জাভেদ বলো, তারপর?

আমি দিনের আলোতে সব দেখছিলাম। বেশ ভাল লাগছিলো যদিও তবুও দেহের ক্ষতগুলো ব্যথায় টনটন করছিলো। নিকটেই একটা ঝর্ণা ছিলো। আমি ঝর্ণার স্বচ্ছ শীতল পানি প্রাণভরে পান করলাম। অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম, তারপর সন্ধান করে চললাম সেই বন্য মানুষটির……

ফিরে আসার কথা ভুলে গেলে তুমি?

হাঁ, আমার তখন শুধু ঐ লোকটার কথা মনে পড়ছিলো। জনহীন নির্জন দ্বীপে মানুষ এলো কোথা হতে।

জাভেদ, তুমি ভাবতে শিখেছো? তোমার মনে চিন্তাবোধ জন্মেছে! কি যে খুশি লাগছে আমার! জাভেদ…কিন্তু তোমার শরীরের ক্ষতগুলো আমাকে ভীষণ ব্যথা দিচ্ছে। ভালোয় ভালোয় সেরে ওঠো এই আমি চাই জাভেদ। আচ্ছা, তুমি দুটো দিন শুধু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছো?

এতোদূর চলে গেছি যেখান থেকে সহজে ফেরা যায়নি।

কি খেয়েছে দুদিন?

গাছের ফল আর ঝর্ণার পানি।

সত্যি আমি একদম ভেঙে পড়েছিলাম। সব সময় মনে হতো ডিরোমা তোমায় হত্যা করেছে। ওর কথাবার্তা কেমন সন্দেহজনক লেগেছে আমার কাছে।

ডিরোমা!

হাঁ, ঐ যে ওখানে যে ঘুমিয়ে আছে। লোকটাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

জাভেদ বলে উঠলো—তোমার ভাল না লাগলে ওর কিছু যায় আসে না। ও খুব ভাল আর সাহসী।

তোমাকে সুন্দর করে কথা বলতে দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি জাভেদ। এখানে তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে বলো? এবার আমি জেগে থাকি, তুমি ঘুমাও জাভেদ।

যদি সেই মানুষখেকো লোকটা আবার আসে?

ঐ তো তোমার পাশে তীর-ধনু রয়েছে, ওটা নিক্ষেপ করে হত্যা করবো।

পারবে তুমি তীর ছুঁড়তে?

পারবো জাভেদ, পারবো। তুমি ঘুমাও……আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাও।

জাভেদের সত্যিই খুব খারাপ লাগছিলো। ঐ মানুষখেকো মানুষটার নখের আঁচড়ের ক্ষতগুলো ব্যথায় টনটন করছিলো। ফুল্লরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো জাভেদ।

ফুল্লরার আনন্দ ধরে না, বুকটা ভরে ওঠে খুশিতে। জাভেদ স্বেচ্ছায় তার কোলে এই প্রথম মাথা রেখে শুয়েছে। অগ্নিশিখার স্বল্প আলোতে নির্নিমেষ নয়নে জাভেদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ফুল্লরা।

কিছুক্ষণ মাত্র।

অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে জাভেদ।

ফুল্লরা ওর চুলে আংগুল বুলিয়ে চলে। ছোটবেলার দৃশ্যগুলো তার মানসপটে ভেসে উঠতে থাকে। একসঙ্গে খেলাধূলা, ছুটাছুটি এমনকি মারামারিও ওরা করেছে। একবার একটি হরিণশিশু ধরে এনেছিলো তাদের এক অনুচর। সুন্দর হরিণশিশুটা নিয়ে জাভেদ আর ফুল্লরার মধ্যে শুরু হয় তুমুল মারামারি। ও বলে হরিণশিটা আমার, সে বলে না ওটা আমার। চুল ধরে টানাটানি তারপর দাঁত দিয়ে কামড়াকামড়ি। জাভেদের হাতে খুব জোরে কামড়ে দিয়েছিলো ফুল্লরা, রক্ত বের করে দিয়েছিলো। কিন্তু জয়ী হতে পারেনি সেদিন ফুল্লরা, জাভেদ হরিণশিশুটা অধিকার করে নিয়েছিলো। সেদিন এমন রাগ হয়েছিলো, আজও সে কথা মনে করলে ফুল্লরার হাসি পায়। ওর মাংস চিবিয়ে খেতে ইচ্ছা করছিলো তার। তারপর আবার আর একদিনের কথা মনে পড়ে ফুল্লরা, সেদিন একটা পাথরের নুড়ি নিয়ে ঝগড়া, শেষ পর্যন্ত লড়াই। এ ওর চুল ধরেছে, তারপর কিল-চড় শেষ পর্যন্ত কামড়াকামড়ি। ভাগ্যিস আম্মু দেখে ফেলেছিলো তাই ছুটে এসে দু'জনকে সামলে নিয়েছিলো, সরিয়ে নিয়েছিলো দুজনকে দু'পাশে। সেদিনও জয়ী হয়েছিলো জাভেদ, পাথরের নুড়িটা জাভেদই অধিকার করে নিয়েছিলো।

সেদিনের বিগত কথাগুলো ভাবতেও বেশ ভাল লাগে ফুল্লরার। খেলার সাথী জাভেদ আজ তার বড় সাধনার কামনার জন। জাভেদকে ছাড়া ফুল্লরা যেন কিছু ভাবতেই পারে না। ও পাশে আছে বলেই বাবা-মা সবার কথা সে ভুলে গেছে, বিস্মৃত হয়েছে সবকিছু।

গভীর জঙ্গল ছাড়া সভ্য সমাজে ফুল্লরা কমই গেছে।

শহর, নগর, বন্দর এসব সে কমই দেখেছে তাই ফুল্লরা শহর, নগর-বন্দরে এলে খুব আশ্চর্য হয়। বিস্ময় নিয়ে দেখে সবকিছু। সভ্য সমাজের লোকজনের সঙ্গে তার তেমন কোনো পরিচয় নেই, বাবা-মা আর নিজেদের লোক ছাড়া কাউকে চিনতে না ফুল্লরা। আজ সে অনেককেই চেনে বা পরিচয় হয়েছে। ভাগ্য তাকে

কোথায় টেনে এনেছে! ক্যাপ্টেন আরফিন হুই সত্যি মহৎ ব্যক্তি। তার স্নেহ-আদর-যত্ন ফুল্লরার মনকে আচ্ছন্ন করেছে, পরিতৃপ্ত ফুল্লরা তার অপরিসীম মধুর ব্যবহারে।

জীবন নিয়ে ফুল্লরার কোনোদিন ভাববার সময় হয়নি, শুধু একজনের কথাই তার ভাবতে ভাল লাগে–সে হলো জাভেদ। কত বারই না ফুল্লরা জাভেদকে হারিয়েছে। তার সন্ধানে কতদিন কত জায়গায় হন্যে হয়ে ঘুরেছে ফুল্লরা তার বাবার অশ্ব দুর্কীকে নিয়ে।

অনেক কথাই ফুল্লরার স্মরণ হচ্ছিলো, হঠাৎ চমকে উঠলো একটা অদ্ভুত শব্দে। ফিরে তাকাতেই দেখলো একটা লোককে কাঁধে তুলে নিয়ে বিস্ময়কর একটি ছায়ামূর্তি দ্রুত জঙ্গলে প্রবেশ করলো।

ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ফুল্লরা।

সঙ্গে সঙ্গে জাভেদ এবং অন্যান্য সবাই জেগে উঠলো।

ফুল্লরার পাশে ছুটে এলো লুসি–কি হয়েছে ফুল্লরা।

সেই ভীষণ মানুষটা আমাদের দলের একজন লোককে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে চলে গেলো ঐ জঙ্গলটার মধ্যে। ভীতকণ্ঠে বললো ফুল্লরা।

ততক্ষণে আরফিন হুই তার অসুস্থ দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

লুসি পাশে যেয়ে দাঁড়াতেই বললেন তিনি কি হয়েছে মা লুসি?

লুসি বুঝতে পারলো তার বাবা ফুল্লরার কথা শুনতে পায়নি। তবু তিনি আন্দাজ করে নিয়েছেন, বললেন পুনরায় ঐ অদ্ভুত মানুষটা এসেছিলো বুঝি?

হাঁ বাবা, একজন নাবিককে কাঁধে তুলে নিয়ে গেছে।

বলো কি মা!

হাঁ বাবা।

দাও আমার রাইফেলটা দাও,

না বাবা, তোমাকে যেতে দেবো না। বরং আমি নিজে যাচ্ছি সবাইকে নিয়ে……

জাভেদ তীর-ধনু হাতে নিয়ে পা বাড়াতেই ফুল্লরা বললো—জাভেদ তুমি যেও না! যেও না জাভেদ। তোমাকেও সে হত্যা করে ফেলবে।

ফুল্লরার কথায় কর্ণপাত না করে জাভেদ তীর-ধনু হাতে প্রবেশ করলো জঙ্গলের মধ্যে।

অন্যান্য নাবিকের মধ্যে অনেকেই পিছিয়ে রইলো আর কয়েকজন জাভেদের পেছনে পেছনে রাইফেল নিয়ে ছুটলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই বললেন–মা লুসি, আমাকে যেতে দাও। আমার দল থেকে একজনকে এভাবে ধরে নিয়ে যাবে আর আমি চুপ করে থাকবো? যেতে দাও মা!

না বাবা, তা হবে না। তুমি ভীষণ অসুস্থ। জাভেদ ফুল্লরার বারণ শুনলো না, সে তীর ধনু নিয়ে চলে গেছে। তার সঙ্গে গেছে আরও কয়েকজন নাবিক। ডিরোমাও না গিয়ে পারেনি, সেও অস্ত্র নিয়ে গেছে বাবা। এবার অদ্ভুত মানুষটাকে ওরা খতম না করে ছাড়বে না।

পারবে না মা, পারবে না……এমন ভীষণ হিংস্র মানুষ আমি কোনোদিন দেখিনি। শরীরে অসুরের শক্তি, যার শক্তির কাছে আমার আগ্নেয় অস্ত্র হার মেনেছে। উঃ! তোমাকে কি বলবো মা লুসি, আমি যখনই ভাবি তখন অবাক হই– এই মানুষটি কে আর কোথায় পেলো সে এতো শক্তি! জানো লুসি, আমি যখন দলবল নিয়ে ঐ অদ্ভুত মানুষটার পেছনে ধাওয়া করে চললাম তখন সে কোনো বনজঙ্গল টিলা কিছু মানছিলো না। কোন বাধাই তার পথরোধ করতে পারেনি। বহুদূর পর্যন্ত গিয়েও তাকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে গুলি ছুঁড়তে পারছিলাম না। শুধু আমি কেন, আমার সহকারীদের মধ্যেও কেউ তাদের অস্ত্রের লক্ষ্যের মধ্যে তাকে পাচ্ছিলো না। সে যেন হিংস্র গন্ডারের মত তীরবেগে ছুটছে। তারপর কোথায় হারিয়ে গেলো আর খুঁজে পেলাম না। একদিকে রাতের অন্ধকার তারপর গভীর জঙ্গল। ওকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলাম বেশ কয়েক বার। আমার সঙ্গী-সাথিগণ তারাও গুলি ছুড়ছিলো কিন্তু সেই অদ্ভুত মানুষটার দেহ গুলি স্পর্শ করতে পারেনি। কোথায় যে সেই অদ্ভুত মানুষটা উধাও হলো ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। বিফল মন নিয়ে ফিরে আসবো ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার জঙ্গলের

মধ্য হতে অদ্ভুত লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো। দূরে ছিটকে পড়লো আমার হাতের রাইফেল, আমি ধরাশায়ী হলাম। অন্ধকারে দেখলাম লোকটার চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলছে। সে আমাকে আক্রমণ করার সময় আমার দলবল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলো, তারা আমার এ অবস্থা দেখতে পায়নি। এ ছাড়াও অনেকে পূর্বেই ভীত আতঙ্কিত হয়ে আমার কাছে অনুমতি নিয়ে তারা জঙ্গলের বাইরে চলে এসেছিলো। লোকটার আক্রমণে আমি জীবনের মায়া ত্যাগ করলাম। তার নখের আঁচড়ে আমার দেহের মাংস ছিঁড়ে আসছিলো, আমি মরিয়া হয়ে নিজকে রক্ষার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু এত বেশি শক্তি লোকটার দেহে যে একচুলও নড়তে পারছিলাম না। লোকটা আমার বুকের কাছে দাঁত বসিয়ে দেবে বলে যেমন উবু হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে জাভেদ কোথা হতে লাফিয়ে পড়লে তার ঘাড়ে।

বাবা!

হাঁ মা, জাভেদ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তারপর শুরু হলো তুমুল লড়াই।

আর তুমি?

আমি ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। দুচোখে আমার বিস্ময়, আমি তাকিয়ে আছি অন্ধকারে। আকাশে অসংখ্য তারকা ছিলো তাই আবছা দেখতে পারছিলাম। গভীর জঙ্গল হলেও তারকারাজির আলোর ছটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে প্রবেশ করেছিলো। প্রথমে তো জাভেদকে চিনতে পারিনি, পরে চিনলাম। বড় খুশি লাগছিলো জাভেদকে দেখে কিন্তু শরীরের যন্ত্রণা আমাকে কাহিল করে ফেলেছিলো। জাভেদ আর নরখাদকে তুমল যুদ্ধ হচ্ছে। কিছু সময়ের মধ্যেই লোকটা জাভেদের কাছে পরাজয় বরণ করলো। তাকিয়ে দেখি সেই ভয়ংকর মানুষটা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। আমাকে জাভেদ কাঁধে তুলে নিলো, তারপর আর কিছু স্মরণ নেই আমার....

বাবা, জাভেদ ছিলো তাই তুমি জীবনে বেঁচে গেছে, নইলে তোমাকে আর কোনোদিন ফিরে পেতাম না। লুসি কথাগুলো বলে বাবার কাঁধে মাথা রাখলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন দুই কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন-ঠিক বলেছিস্ মা জাভেদের জন্যই পর পর কয়েক বার আমরা বিপদমুক্ত হয়েছি কিন্তু......

এমন সময় ফিরে এলো ডিরোমা এবং তার সঙ্গীরা।

জাভেদও ফিরে এলো। তার হাতে তীর-ধনু রয়েছে।

ডিলোমা ও দলবল জঙ্গল হতে বেরিয়ে আসতেই ক্যাপটেন আরফিন হুই বললেন–নরখাদকটিকে পেলে না?

না, তার কোন চিহ্নই আমরা খুঁজে পেলাম না। বললো ডিরোমা।

লুসি তাকালো জাভেদের মুখমন্ডলে, দেখতে পেলো সে মুখে একটা হিংস্র ক্রুদ্ধভাব। বলল লুসি–হিরো, তুমিও বিফল হলে সেই ভয়ংকর মানুষটার সন্ধানে?

অত্যন্ত দ্রুত চলতে পারে সে, তাই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেছে। বললো জাভেদ।

ফুল্লরা জাভেদের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু বোঝার চেষ্টা করছিলো। সে সহজে কাবু হওয়ার লোক নয়, কে সেই বিস্ময়কর মানুষ যার কাছে জাভেদ হার মেনে ফিরে এসেছে।

এই ঘটনার পর কেউ স্বস্তি পাচ্ছিলো না।

তাদের দলের একজন হারিয়ে গেলো, নিশ্চয়ই তার মৃত্যু ঘটেছে। আর সে ফিরে আসবে না।

তবুও ক্যাপটেন আরফিন অসুস্থ শরীর নিয়ে দলবলসহ বহু খোঁজ করলেন কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না নাবিক সহকারীটিকে।

পরদিন কারও চোখে ঘুম নেই।

সবাই জেগে জেগে পাহারা দিচ্ছে।

এমনি ফুল্লরা আর লুসিও ঘুমোত পারেনি।

সবার চোখ যদিও ঘুমে জড়িয়ে আসছে তবুও কেউ শয্যা গ্রহণ করছে না। না জানি কোন্ মুহূর্তে আবার সেই নরখাদক এসে আর একজনকে তুলে নিয়ে যাবে!

জাভেদ কিন্তু কারো নিষেধ শোনেনি, সে গভীর জঙ্গলে সন্ধান করে ফিরছে, হাতে তার তীর-ধনু।

*

অনেক রাত।

তবুও ফিরে আসেনি জাভেদ।

ফুল্লরাই শুধু ব্যস্ত চিন্তিত হয়নি, ক্যাপ্টেন আরফিন হুইও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন জাভেদ জঙ্গল থেকে ফিরে আসছে না বলে। ডিরোমাকে এত বিপদেও খুশি খুশি মনে হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে সে লুসির সঙ্গে ভাব জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলো।

লুসি যদিও তাকে পাত্তাই দিচ্ছিলো না তবুও ডিরোমা সব সময় লুসির কাছাকাছি থাকার জন্য একান্ত আগ্রহ দেখাচ্ছিলো। কারণে অকারণে এটা সেটা নিয়ে আলাপ জমানোর সুযোগ করে নিতে চায় সে। অবশ্য এমন মনোভাব তার পূর্বে ছিলো না, লুসিকে নিয়ে ডিরোমা ভাববার সাহস পায়নি। যখনই সে দেখলো লুসি জাভেদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তখনই এটা চিন্তা তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করলো। লুসির সৌন্দর্য তাকে নতুন করে মুগ্ধ অভিভূত করলো। হাত বাড়ালেই যদি তাকে পাওয়া যায় মন্দ কি! তাছাড়া লুসিকে জয় করতে পারলে জাহাজ এলুনের মালিক হওয়ার সাধ পূর্ণ হবে একদিন। কারণ ক্যাপটেন আরফিন হুইয়ের পর তার একমাত্র কন্যা লুসিই পিতার যথাসর্বস্বের মালিক হবে। কাজেই লুসির জন্য রয়েছে যা কিছু তা লুসিকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসবে তার হাতের মুঠোয়। তা ছাড়া লুসি সুন্দরী বটে। মাথায় রেশমী সোনালী চুল, মায়াময় হরিণীর মত দুটি চোখ। গোলাপের পাপড়ির চেয়ে কম নয় তার দেহের বর্ণ। অবশ্য ক্যাপটেন হুইয়ের মত তার কথা বলার ভঙ্গী হলেও মা এলুনের চেহারার সঙ্গে লুসির চেহারার মিল আছে যথেষ্ট।

এ কারণে ক্যাপটেন হুই কন্যার মধ্যে তার হারানো প্রিয়াকে খুঁজে পান যেন নিজের অলক্ষ্যে। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন আরফিন দুই কন্যার মুখের দিকে। ভুলে যান তিনি নিজের অস্তিত্ব, সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেন না।

লুসি কোনো কোনো সময় হেসে বলে বাবা, তুমি অমন হা করে আমার মধ্যে কি খোজো বলো দেখি।

কিছু না মা লুসি! বললেন আরফিন হুই।

লুসিকে না বললেও সে ঠিকই বুঝতে বাবার মনে মায়ের স্মৃতি ভেসে উঠছে। মাকে যখন তার স্মরণ হয় তখন তিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নির্বাক দৃষ্টি মেলে। লুসি বলতোবাবা, তুমি যাই বলো আমি জানি কি খোজো তুমি আমার মধ্যে।

সত্যি জানিস মা?

হাঁ বাবা, তুমি মায়ের স্মৃতি আমার মধ্যে খুঁজে ফেরো। তুমি না বললেও আমি ঠিক বুঝতে পারি, কারণ আমি আগের সেই ছোট্ট লুসিটি এখন আর নই। বাবা, তুমি মাকে এতো ভালবাসতে?

বাসতাম, তবু তো ধরে রাখতে পারিনি। আমার ভালবাসা, ছোট্টো মা মনির……

লুসি বাবার মুখে হাতচাপা দিয়ে বলতো–তা বাবা, তুমি মায়ের কথা মনে করে মনে কষ্ট পাও এ আমি চাই না। যে যাবার চলে গেছে তাকে নিয়ে এতো ভাবতে হবে কেন? লুসির মনেও মায়ের কথা স্মরণ হলে একটা দারুণ ব্যথা খচ খচ করে ওঠে তবুও সে নিজের মনের ব্যথা চেপে চাপা রেখে পিতার ব্যথাকে লাঘব করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ পৃথিবীতে একমাত্র তার বাবা ছাড়া আর কেই বা আছে। লুসি বাবার মধ্যে বাবা-মার স্নেহ খুঁজে পায় তাই বাবাকে সে হারাতে চায় না। লুসি যে মাকে নিয়ে ভাবতো না তা নয়, কিন্তু বাবা যেন বুঝতে না পারে তার মনের কথা তাই নির্জন ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে আনমনা হয়ে যেতো। পৃথিবীটা তখন তার কাছে একটা যন্ত্রণাময় স্থান বলে মনে হতো। কেনইবা জন্ম হয় আবার কেনোইবা মৃত্যু ঘটে। সব কিছু নিয়েই ভাবতে লুসি, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতো। জন্ম এবং মৃত্যু এ দুটো থেকে কারও রক্ষা নেই। পৃথিবীর মায়ার বন্ধন কাউকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। সবাইকে একদিন যেতে হবে সবকিছু ত্যাগ করে। তার মা গেছেন, বাবাকেও যেতে হবে, তাকেও ধরে রাখতে পারবে না লুসি তবুও ভাবতে পারে না লুসি বাবার মৃত্যুর কথা! না না, বাবাকে মরতে দেবে না সে, তার মৃত্যু হবার পূর্বে লুসি যেন পৃথিবী থেকে বিদায়

নিতে পারে। কিন্তু মৃত্যু কাউকে রেহাই দেয় না, সবই বোঝে লুসি তবুও যেন কেমন এলোমেলো চিন্তা তাকে গ্রাস করে।

লুসি চোখ মুছে ঘুমাবার চেষ্টা করে। ভাবতে চায় না কিছু তবুও ভাবনা এসে যায়। মা থামলে লুসিকে হয়তো ভাবতে হতো না, বাবার জন্য মাই থাকতো এবং তিনিই যথেষ্ট।

*

মাথুন দ্বীপে কয়েকদিন কেটে গেলো।

ক্যাপটেন আরফিন হুই যে কারণে এ দ্বীপে এসেছেন সে ব্যাপারে অনেকটা পিছিয়ে পড়লেন। কয়েকদিনে তিনি তিনজন সহকারী নাবিককে হারিয়েছেন। যারা আছেন তাদের মধ্যেও একটা ভীষণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সবাই সোনার মায়া ত্যাগ করে জাহাজে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। জাভেদ চলে গেলেও আবার সে ফিরে এসেছে, মাঝে মধ্যেই কাউকে কিছু না জানিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যায়। হয়তো সমস্ত দিন তার কোনো সন্ধান মেলে না। সন্ধ্যার পর কিংবা গভীর রাতে ফিরে আসে জাভেদ এক কোচড় ফল নিয়ে। কোনো জীবজন্তুর সন্ধান পেলে হয়তো শিকার করে নিয়ে আসতো। আগুনে পুড়িয়ে খেতে। ওরা। তীর-ধনু ছাড়াও আজকাল জাভেদ রাইফেল সঙ্গে নিতো।

জাভেদ সেদিন ফিরে এলে আরফিন হুই ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন–তুমি সেই নরখাদকটির পেছনে ধাওয়া করে চলে গেলে তারপর আর ফিরে এলে না। আমরা বড়ড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম, যদিও আমার দলের লোককে নরখাদক ধরে নিয়ে গেছে তবুও এত ভীত আতঙ্কিত হইনি। সত্যি জাভেদ, তুমি ফিরে না এলে আমি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়তাম।

জাভেদ একটু হাসলো শুধু।

বলেছিলেন আরফিন হুই–জাভেদ, এমন করে গভীর জঙ্গলে চলে যেও না, হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জাভেদ এ কথাতেও কোনো জবাব দেয়নি।

তিনজন সহকারীকে হারিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন আর উকুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন আরফিন। বহুবার তিনি বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু এমন অবস্থায় কখনও পড়েননি।

লুসি আর ফুল্লরাও ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

বিশেষ করে পিতার দুশ্চিন্তা আর উদ্বিগ্নতা লুসির মনকে ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লুসি কোনোদিন কোনো কথা বলেনি। সে জানে তার বাবা অহেতুক কিছু করেন না। বাবার মধ্যে লুসি কোনোদিন অন্যায় কিছু দেখেনি, আর দেখেনি বলেই তার বিশ্বাস বাবা কোনো মন্দ কাজ করতে পারে না। মাঝে মাঝে লুসির মনে হয় তার বাবা ছাড়া আর কেউ বুঝি এ পৃথিবীতে এমন সৎ-মহৎ ব্যক্তি নেই। এহেন বাবাকে লুসি কোনো সময় কষ্ট দিতে চায় না।

বাবা তার সহকারী প্রিয় নাবিকদের হারিয়ে ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। কত বিপদই না এসেছে তার বাবার ওপরে কিন্তু বাবাকে সে এমনভাবে বিচলিত হতে দেখেনি কোনোদিন।

সমস্ত দিন ধরে তবুও কাজ চলে।

নাবিকদের নিয়ে ক্যাপেটেন আরফিন দুই নিজে কোদাল চালান এবং স্বর্ণ মেশানো মাটি নিয়ে বস্তা বোঝাই করেন। আর বেশি দিন এ দ্বীপে থাকার ইচ্ছা তার নেই। যত শীঘ্র এ দ্বীপ ত্যাগ কর যায় ততই মঙ্গল কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তার এ অভিযান সেই উদ্দেশ্য সফল না হলে সব যে তার ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নাবিকগণ যদিও ভীত-আতঙ্কিত তবুও তারা মালিকের নির্দেশমত কাজ করে চললো। সবাই শাবল-কোদাল চালিয়ে চলছে, মাথার উপরে সূর্য অগ্নিবর্ষণ করছে। আকাশ মেঘশূন্য।

শ্রমিক নাবিকদের দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে।

কেউ কেউ হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে আবার কোদাল চালাচ্ছে। কারও কারও জামাটা ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে, জামাটা খুলে রেখেছে কাঁধে। কেউ বা পাশের বড় গাছটার নিচে বসে জিরিয়ে নিচ্ছে।

আরফিন হুই নিজেও মাটি কাটছেন সবার সঙ্গে।

লুসি এ দৃশ্য লক্ষ্য করছিলো, সে এগিয়ে এলো পিতার পাশে, ব্যথিত কণ্ঠে বললো বাবা, তুমি নিজের হাতে কোদাল চালাও এটা আমি চাই না। আমাকে দাও কোদালটা, তোমার চেয়ে আমি ভাল কোদাল চালাতে জানি।

হেসে বললেন ক্যাপটেন হুইমা লুসি, তুই কচি মেয়ে। আমি পুরুষ মানুষ, আমার হাত দু'খানা এখনও সবল আছে।

সব সময় তুমি এই ধরনের কথা বলে আমাকে কচি খুকি বানিয়ে রেখেছে। ওসব আমি শুনব না, তোমার কোদালখানা আমাকে দেবে কিনা বলো?

ক্যাপটেন আরফিন হুই জানতেন তার মা-মরা মেয়েটা বড্ড জেদী আর একগুয়ে। যদি সে রাগ বা অভিমান করে তাহলে বড় মুশকিল! কিছুতেই তাকে সোজা করা যাবে না। তাই আরফিন হুই নিজের কোদালখানা এগিয়ে দিলেন কন্যার দিকে-লুসি, তুমি মাটি কাটো এ আমি চাই না, তবে তুমি যাতে খুশি তাই আমার কাম্য।

এমন সময় হঠাৎ একটা আর্তচীৎকার শোনা গেলো।

যারা মাটি কাটছিলো তারা ভীত আতঙ্কিত হয়ে তাকালো যে দিক থেকে আর্তনাদ ভেসে এসেছে সেই দিকে। সবাই দেখলো গাছের তলায় বিশ্রামরত ব্যক্তিটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হলো সেই ভয়ংকর মানুষটা।

সঙ্গে সঙ্গে আরফিন হুই রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়লেন সেই মানুষটাকে লক্ষ্য করে। পর পর কয়েকবার গুলি ছুঁড়লেন তিনি।

ডিরোমা অদুরে কোদাল নিয়ে মাটি কোপাচ্ছিলো।

সে ছুটে গেলো তার রাইফেলটা হাতে নিয়ে কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। তবু সে ফাঁকা গুলি করে চললো কিছুক্ষণ ধরে। সবাই বিস্ময় বিস্ফারিত আতঙ্কিত চোখে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের কোদাল-শাবল ফেলে দিয়েছে তারা। জীবনের বিনিময়ে তারা সোনা চায় না।

আরফিন হুই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন, তার মুখমন্ডল ফ্যাকাশে লাগছে। হাতের রাইফেলখানা তার হাতেই রয়ে গেলো। স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইলো তিনি।

ফুল্লরা ও লুসি ক্যাপটেন আরফিন হুইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের চোখেমুখে ভয়, বিস্ময় আর ভীষণ আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে।

জাভেদ গত সন্ধ্যায় গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, আজও সে ফিরে আসেনি। ফুল্লরা আর ভাবতে পারে না, জাভেদের জন্য ভাবতে ভাবতে তার চোখের নিচে কালিমা পড়েছে। ম্লান মুখে তাকিয়ে আছে ফুল্লরার গভীর জঙ্গলটার দিকে। কত বার বারণ করেছিলো সে জাভেদকে কিন্তু কিছুতেই তারে ধরে রাখতে পারেনি। কারও কোনো কথা সে শোনে না, নিজের যা খেয়াল হয় তাই সে করে।

আরফিন হুই আর ডিরোমা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে চাইলেন কিন্তু লুসি ও তার দলবলের বারণ কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলেন না। লুসি তো এঁটে ধরলো তার বাবার হাত–বাবা, আমি কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবো না ঐ জঙ্গলে!

মা, আমাদের কয়েকজনকে হারালাম কি হবে আমার বেঁচে! মরতে হয় মরবো তবু আমি দেখবো কে ঐ মানুষ আর কোথায় ওর সন্ধান। তা জেনে না নিয়ে আমি ফিরবো না।

লুসি জানে তার বাবা যা বলেন তা তিনি করেন, বড় জেদী মানুষ তিনি।

সেদিনের ঘটনার পর ক্যাপটেন আরফিন দুই ভীষণ কঠিন হয়ে উঠলেন। তিনি স্বর্ণসংগ্রহ ক্ষান্ত রেখে সেই বিস্ময়কর মানুষটির সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটে চললেন এখানে সেখানে। বাধ্য হলো তার দলবল তাকে অনুসরণ করতে।

জাভেদ ফিরে এলো। অকস্মাৎ যেমন সে চলে গিয়েছিলো তেমনি হঠাৎ এসে হাজির হলেন ক্যাপটেন আরফিন হুই যখন জঙ্গলে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে।

ক্যাপটেন হুইয়ের চোখ দুটো আনন্দে জ্বলে উঠলো, কারণ জাভেদের ওপর তার অনেক ভরসা।

লুসি আর ফুল্লরা খুশি হলো অনেক।

ফুল্লরার মনে একটা বিষণ্ণতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো এখন তা দূরীভূত হয়েছে।

লুসি এবার চুপ থাকতে পারলো না, সে জাভেদের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো— তুমি বড দুষ্ট! কাউকে কিছু না বলে এমন করে কোথায় উধাও হও বলোত

জাভেদ বললো—-বলে যাবার সময় হলো কই? সেই অদ্ভুত লোকটাকে তাড়া করে গেলাম কিন্তু সমস্ত জঙ্গল চষে ফিরলাম কোথাও পেলাম না।

লুসি বললো—চরম আশ্চর্যকর ব্যাপার। বাবার কাছে শুনেছি দ্বীপে কোনো জীবজন্তু বা কোনো প্রাণী নেই অথচ…

হাঁ মা, যা শুনেছিলে তা সত্য কিন্তু……আর বিলম্ব করা উচিত হবে না জাভেদ চলো আমাদের সঙ্গে।

চলো বাবা, বলল লুসি।

সবাই মিলে জঙ্গলে প্রবেশ করলো।

প্রত্যেকের হাতে এক একটা রাইফেল এবং জ্বলন্ত মশাল।

মশালের আলো জঙ্গলের অন্ধকার দূরীভূত করলেও সব কিছু স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো না। কারণ জঙ্গলের স্থানে স্থানে ঘন বৃক্ষলতাগুচ্ছ হওয়ায় জমাট অন্ধকারে আচ্ছন তাই মশালের আলোতেও সবদিকে নজর চলে না।

ক্যাপটেন হুইয়ের একহাতে রাইফেল অপর হাতে পাওয়ার ফুল টর্চটা। তিনি অসুস্থ অবস্থায় দীপ্ত পদক্ষেপে চলেছেন। দলবল তার পেছনে এমন কি লুসি আর ফুল্লরাও আজ পিতার সঙ্গে গহন জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। ডিরোমা সবার পেছনে।

জাভেদ ক্যাপটেন আরফিন হুইয়ের পাশে পাশে চলেছে। তার পিঠে তীর-ধনু বাধা। প্রস্তুত হয়ে চললো জাভেদ, যে কোনো মুহূর্তে তীর-ধনু হাতে নিয়ে যেন শত্রুকে আক্রমণ করতে পারে। চোখমুখে ক্রুদ্ধ হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে তার।

সকলের হাতে মশাল থাকায় গভীর জঙ্গলেও পথ চলতে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। বন্য জীবজন্তুর ভয় নেই, ভয় শুধু ঐ একজনকে নরখাদক মানুষটির।

*

একসময় দিনের আলো নিভে গেলো, নেমে এলো রাতের অন্ধকার। আবার রাত ভোর হলো, সূর্যের আলোতে ঝলমল করে উঠলো মাথুন দ্বীপের বুক। ক্রমান্বয়ে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লো ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের দলবল। ভয়ংকর মানুষটির নখের ক্ষতগুলোও বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন হুইয়ের দেহে।

মিস্ লুসি পিতার জন্য চিন্তিত, হঠাৎ কিছু হয়ে না পড়ে।

জন্মাবার পর থেকেই লুসি তার বাবাকে দেখে আসছে একটি কঠিন মানুষ হিসেবে। কোনোদিন সে তার বাবাকে ক্লান্তি আর অবসাদে মুষড়ে পড়তে দেখেনি। এবার তার বাবার মুখে একটা বিষণ্নতার ছাপ দেখতে পাচ্ছে। প্রথম যেদিন তার বাবা মাথুন দ্বীপে পা রাখলেন সেদিন তিনি ছোট্ট শিশুর মতই আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন। মাথুনের মাটি তার সমস্ত দেহমনে খুশির উদাস বয়ে এনেছিলো। মাথুনের মাটিতে সোনার কণিকা দেশে দু'হাতে মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে মাথায়, চোখেমুখে মেখেছিলেন তিনি পাগলের মত।

সেদিন লুসির আনন্দ যেন ধরছিলো না। বাবাকে যেন সে প্রথম দেখলো নতুন এক মানুষ হিসেবে। বাবা বুঝি ছোট্ট শিশুটি বনে গিয়েছিলেন সেদিন। লুসি জানতো তার বাবা কি চান আর কেনই বা মাপুন দ্বীপে এসেছেন। মাথুনের সম্পদ বয়ে নিয়ে যাবেন তিনি তার দেশে। অগণিত মানুষ যারা ক্ষুধায় কাতর তাদের মুখে অন্ন তুলে দেবেন তার বাবা। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশী তার বাবাকে ভীষণ ভাবিয়ে তোলে, শ্রমিকরা যখন তাদের দেহের বল হারিয়ে ফেলে, তখন তারা ঠিক পূর্বের মত পরিশ্রম করতে সক্ষম হয় না, তখন ওরা শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়ে। এদের জন্য বাবাকে লুসি অনেক ভাবতে দেখেছে, এদের জন্য কিছু একটা করা দরকার। পুত্রকন্যা সবাই বেচে থাকলেও তারা পঙ্গু অসহায় বাবা-মার জন্য তেমন করে কিছু করতে পারে না কারণ তাদের কাঁধে তখন অনেক ঝামেলা এসে পড়ে। বাবা-মাকে নিয়ে ভাবা তাদের চরম কর্তব্য জেনেও কর্তব্য পালনে সক্ষম হয় না। তারপর নিজেরাও একদিন সেই পর্যায়ে এসে পড়ে, তখন উপলব্ধি করে হৃদয় মন দিয়ে যে, তাদের বাবা-মারাও এমনি এক সময় কুঁকড়ে গিয়েছিলো। এ ছাড়াও আছে আরও অনেক মানুষ যারা খেটে খাবার অযোগ্য। বাবা তাদের জন্যও ভাবছে। যদি মাথুন তার বাবাকে সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবার সুযোগ দেয় তাহলে অনেক কিছু করবেন দেশের জনগণের জন্য কিন্তু বাবা এমন হয়ে গেলেন কেন।

লুসি ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলে।

হঠাৎ চমকে ওঠে লুসি।

সবাই এগিয়ে চলছিলো। ঘন জঙ্গল পেরিয়ে এখন তারা সামনের পর্বতমালার দিকে এগুচ্ছিলো। মাথুন দ্বীপে এমন পর্বতমালা আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কারণ ঘন জঙ্গলে গোটা আকাশটা যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। জঙ্গল পেরিয়ে এপারে এসে অবাক হলো সবাই। ক্যাপটেন আরফিন হুই জানেন না। এ দ্বীপটা কত বড়, শুধু আরফিন হুই কেন কেউ জানে না। এতো বড় দ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক জুড়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা ভাসমান পৃথিবীর মত।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই এবং তার দলবল সবাই ক্ষান্ত হয়ে পড়েছে, গোটা জঙ্গলটা তারা জ্বলন্ত মশাল হাতে চষে ফিরেছে কিন্তু সেই নরখাদটিকে কোথাও খুঁজে পায়নি।

অনেকের দেহ কাঁটার আচড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

বহু কাটা বিদ্ধ হয়েছে অনেকের শরীরে। পায়ে ভারী বুট থাকায় পা তাদের অক্ষত রয়েছে বটে কিন্তু চলৎশক্তি রহিত প্রায়।

ভোরের সূর্যকিরণে মাথুনের মাটিতে অসংখ্য সূর্য কণিকা ঝ ম করছে। চারদিকে শুধু অপূর্ব চুমকির ছড়াছড়ি। অতৃপ্ত নয়নে সবাই দেখছে কিন্তু কেউ একমুঠো হাতে তুলে নিচ্ছে না, কারণ তারা জীবন রক্ষার্থে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সবার মনেই আতঙ্ক না জানি কোন্ মুহূর্তে ঐ নরখাদক আবার কাকে ধরে নিয়ে যায়।

জাভেদ সর্বাগ্রে চলেছে।

তার হাতে বিষাক্ত তীর-ধনু, একটি তীর ঐ নরখাদকের দেহে বিদ্ধ করতে পারলে তাদের আর কোনো ভয় থাকবে না। ওর মৃত্যু হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জাভেদ একা একা গোটা জঙ্গলটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু কোথাও সেই নরখাদকের দেখা পায়নি।

একটি নয়, তিনজন নাবিক নিখোঁজ হয়েছে।

সবাইকে সেই বিস্ময়কর মানুষটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেছে অতি সহজে, সবার অজ্ঞাতে। ডিরোমা নিজেও ভীত হয়ে পড়েছে, সোনার মোহ তার কেটে গেছে। এবার নাবিকদের মধ্যে ডিরোমা বিদ্রোহ মনোভাব জাগিয়ে তুলেছে। সবাই জাহাজে ফিরে যাবার জন্য আগ্রহান্বিত, তারা ক্যাপটেন আরফিনের কথা শুনতে রাজি নয়।

কিন্তু ক্যাপ্টেন আরফিন বিফল মনে ফিরে যাবার লোক নন, তার ইস্পাতের মত কঠিন দেহটা ক্ষতবিক্ষত হলেও দৃঢ় তার মনোবল। হারিয়েছেন তার প্রাণপ্রিয় কয়েকজন নাবিককে। হারিয়েছেন দেহের শক্তি কিন্তু মনোবল তিনি হারাননি। নর খাদককে পরাজিত করে, তাকে হত্যা করে মাথুন দ্বীপকে শত্রুমুক্ত করবেন, তারপর ইচ্ছামত মাথুনের স্বর্ণ মেশানো মাটি জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে যাবেন নিজের দেশে। আসবে কোটি কোটি টাকা, ইচ্ছামত দীনহীন গরিব মানুষদের মধ্যে তিনি বিলিয়ে দেবেন প্রাণভরে।

সে আশা কি পূর্ণ হবে ক্যাপটেন আরফিন হুইয়ের।

অনেকদিনের সাধ তার স্ত্রী এলুনের নামে একটি ধর্মশালা তৈরি করবেন। যে ধর্মশালায় লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে। বাবার স্বপ্ন সব জানে লুসি, আরও জানে কত কষ্টই না করেছেন তিনি জীবনে।

ভাবছিলো আর পথ চলছিলো লুসি একজন নাবিক সামনে আংগুল দিয়ে দূরে দেখিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললো—ঐ দেখুন ক্যাপটেন। ঐ দেখুন......

সকলের দৃষ্টি চলে গেলো দূরে অনেক দূরে পর্বতমালার মাঝামাঝি একটি অসমতল স্থানে। দেখা গেলো সেই ভয়ংকর নরখাদক ওদিকে মুখ করে একটি অর্ধগলিত মনুষ্যদেহ খাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একটি হাত মৃত দেহটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

ক্যাপটেন আরফিন হুই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, লুসি বললো–বাবা, তোমরা চুপ করো। একটু শব্দ শুনলেই পালিয়ে যাবে। জাভেদের দিকে তাকালো লুসি।

জাভেদের চোখ দুটো জ্বলছে।

হাতের তীরফলক ধনুতে সংযোগ করে লক্ষ্য করছে জাভেদ।

ক্লান্ত অবসন্ন ক্যাপটেন আরফিনের দলবলের চোখেমুখে ফুটে উঠলো একটা প্রতিহিংসার আগুন। তাদেরই সঙ্গী তিন জনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে খেয়েছে ঐ নরখাদক।

জাভেদের তীর ততক্ষণে ধনু থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

মুহূর্তে পর্বতমালার মধ্যভাগে সমতল স্থানে সেই বিস্ময়কর মানুষটা ঢলে পড়লো। একটা শব্দও বের হলো না তার মুখ থেকে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন আরফিন হুই ও তার দলবল সকলেই। ওরা ভুলে গেলে ক্লান্তি অবসাদ সব কষ্টের কথা।

লুসি ছুটে গিয়ে জাভেদের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলো, আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বললো—জাভেদ, তুমি মহাবীর, অসীম সাহসী.....তুমি আমার বন্ধু.....আমার প্রিয়...।

ফুল্লরার মুখমন্ডল কালো হয়ে উঠলো, সে পছন্দ করলো না লুসি জাভেদকে ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গন করায়।

এদিকে সবাই ছুটলো সেই নরখাদকটির ভুলুণ্ঠিত দেহটার দিকে।

পর্বতমালার যে স্থানটিতে নরখাদক বসে তার শিকার খাচ্ছিলো ঐ জায়গাটি পর্বতের উপরিভাগের মাঝামাঝি।

আরফিন হুইয়ের দলবল সেই স্থান লক্ষ্য করে চলতে লাগলো।

তারা ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলে তাদের সব কষ্টের কথা। প্রাণপণ শক্তিতে এগুচ্ছে

উঁচুনীচু অসমতল জায়গা।

আগাছা ঝোঁপঝাড় তেমন কিছু নেই, তবে মাটি আর পাথরের কুচির সঙ্গে অসংখ্য স্বর্ণকণিকা মেশানো আছে। সূর্যের আলোকে পর্বতমালাটিকে মনিমুক্তাখচিত রাজসিংহাসন বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু সেদিকে কারও খেয়াল নেই।

তখন সবাই দৌড়ে চলেছে ঐ নরখাদটি যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেখানে।

তীর-ধনু হাতে জাভেদ।

ডিরোমা আর ক্যাপটেন আরফিন হুই চলেছে তার পেছনে।

অন্যান্য সকলের সঙ্গে লুসি আর ফুল্লরা।

লুসি ফুল্লরার হাত ধরে সাহায্য করছে তার চলায়। কখনও বা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ফুল্লরা, কখনও বা বসে পড়ছে মাটিতে কারণ তার পা দু'খানা বড় অবশ লাগছিলো।

ফুল্লরার ইচ্ছা নয় সে লুসির সাহায্য গ্রহণ করে। সে চায় না তার হাত ধরে তুলে দেয় লুসি। ফুল্লরা তবুও অনিচ্ছাসত্বেও লুসির হাত ধরতে বাধ্য হচ্ছিলো।

এক সময় পর্বতমালার সেই অংশে পৌঁছে গেলে সবাই মিলে। দেখলো তারা নরখাদকটি তার অতি প্রিয় খাদ্য গলিত নরদেহটার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার হাতের মুঠায় আধ-খাওয়া একখানা হাত। জাভেদ বা হাতে নরখাদটিকে চীৎ করে ফেললো।

একসঙ্গে সবাই চমকে উঠলো নরখাদকটির কি ভয়ংকর চেহারা। এতদিন কেউ তাকে স্পষ্টভাবে দেখবার সুযোগ পায়নি। আজ সবাই হতবাক হয়ে দেখছে। সমস্ত শরীরে ময়লা জমে কালো কয়লার মত লাগছে। মাথার চুল প্রায় পিঠের মাঝামাঝি কাঁধে ঘাড়ে জটা ধরে খোবড়ার মত পড়ে আছে। দাড়ি আর গোঁফে ঢাকা গোটা মুখ। দাড়ি আর গোঁফে মানুষের রক্ত আর মাংসের রক্ত শক্ত হয়ে জমে আছে। ভ্রু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে। দাঁতগুলো মস্ত বড় এবং ময়লা জমে পাথরের তৈরি দাঁত মনে হচ্ছে। দাঁতগুলো ভীষণ বড়, ঠোঁটের নিচে ঝুলে পড়েছে। পিঠের এ পাশে জাভেদের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ততীর বিদ্ধ হয়ে আছে।

জাভেদ নরখাদকের প্রাণহীন দেহ হতে বিষাক্ত তীরখানা একটানে তুলে নিলো।

ক্যাপটেন আরফিন বললেন–বিস্ময়কর মানুষ! মানুষের মাংস খেয়ে ওর এমন একটা নেশা ধরে গিয়েছিলো যার জন্য সে ভয়ংকর হয়ে উঠেছিলো।

ডিরোমা বললো–ওটা মানুষ নয়, ভূত অথবা রাক্ষস!

হাসলো লুসি–ভূত আছে নাকি? তবে রাক্ষস হতে পারে। জাভেদ রাক্ষসটিকে বধ করে বাবার যাত্রাকে জয়যুক্ত করে তুললো।

ডিরোমা মুখখানা ভার করে ফেললো। একটা হিংসাত্নক মনোভাব তার ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো সে জাভেদকে।

ক্যাপটেন আরফিন হুইয়ের ক্লান্ত জড়ানো মুখোভাব এক্ষণে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তার দেহের ক্ষতগুলো যেন মুহূর্তে সম্পূর্ণ সেরে গেছে। আরফিন হুই জাভেদের হাতখানা মুঠায় চেপে বললেন-বন্ধু, আমার প্রিয় সন্তান, আমার স্নেহের জাভেদ, তোমার জন্য আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ রইলো। তুমি আমাকে সর্বতোভাবে জয়ী করলে......আমি ভাবতেও পারিনি নরখাদকটিকে এভাবে এত সহজে নিপাত করতে সক্ষম হবে। শুধু তোমার জন্য আমরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারলাম।

জাভেদ বললো—আপনারা এবার আপনাদের কাজ সমাধা করুন।

হাঁ জাভেদ, তোমার কথা ঠিক। এবার আমরা কাজ শুরু করবো তবে আমার ইচ্ছা একবার পতটা পরীক্ষা করে দেখবো।

হাঁ বাবা, ঠিক বলেছো। আমরা পর্বতটার উপরে উঠতে চাই। কিন্তু তোমার কষ্ট হবে বাবা!

না মা, আমার কষ্ট হবে না। তোমাদের সাহায্য পেলে আমি অনায়াসে পর্বতমালার উপরে উঠতে পারবো। কিন্তু তার পূর্বে এই নরখাদকটির সম্বন্ধে আমার জানা দরকার। ক্যাপটেন আরফিন দুই তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলেন নরখাদটিকে। নরখাদকটির হা করা মুখগহ্বরে তখনও নরমাংস ভর্তি রয়েছে। একটা পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

লুসি আর ফুল্লরা নাকে রুমাল চাপা দিলো।

অন্যান্য নাবিকও নাক ধরেছে।

সকলের চোখেমুখে বিস্ময়কর ভাব ফুটে উঠেছে, সবাই দেখছে অবাক চোখে। তাদেরই একজন সঙ্গীর করুণ অবস্থা দর্শন করে সকলে মর্মাহত হলো, কি ভয়ংকর নৃশংস দৃশ্য! অনেকেই মৃত দেহটার অংশবিশেষ দেখে তাদের সঙ্গীকে চিনতে পারলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই বললেন নাবিক ডান্ হুইয়ের শেষ পরিণতি এটা!

অন্যান্য নাবিক বললো—-হা ক্যাপটেন আমরাও চিনতে পেরেছি ডন হুইয়ের গলিত দেহটা.....

সকলে মিলে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে ডন হুইয়ের গলিত দেহটা পর্বতের গায়ে একটা গর্ত খনন করে ঢেকে দিলো।

তারপর সবাই পর্বতটার উপরিভাগে উঠতে লাগলো।

ক্যাপটেন হুইয়ের দেহ বেদনায় জর্জরিত, তাই তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তবুও উপরে উঠতে লাগলেন। লুসি আর ডিরোমা তাকে সাহায্য করছিলো।

অদ্ভুত আর অপূর্ব।

রৌদ্রশিখায় পর্বতমালাটিকে মণি-মুক্তাখচিত কোনো পর্বত বলে মনে হচ্ছে। সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। এত সুন্দর আর মনোরম দৃশ্য এ পৃথিবীতে কোথাও বুঝি নেই। ক্যাপটেন আরফিন হুই উচ্ছল আনন্দে ভরপুর। তার চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

লুসি পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ তৃপ্তিবোধ করছে। এ দ্বীপে যাকে ভয়, তার নিপাত ঘটেছে। এবার ক্যাপটেন হুই আনন্দমুখর হয়ে উঠেছেন। সবাইকে নিয়ে নরখাদকটির মৃতদেহ টেনে পর্বতটার এক উচ্চস্থানে নিয়ে এলেন ক্যাপটেন হুই। এবার তার দেহটা নিচে নিক্ষেপ করবেন।

এমন সময় জাভেদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলো, ক্যাপটেন হুইকে লক্ষ্য করে বললো— বাবা এদিকে এসো......বাবা এদিকে এসো..

ক্যাপটেন আরফিন হুই এবং তার দলবল সবাই জাভেদের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিস্ময়ভরা চোখে তারা দেখলো একটা গুহার মধ্যে বহু নরকংকাল স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। একটা মরচে ধরা রাইফেল শক্ত হয়ে পড়ে আছে এক পাশে।

জাভেদ বললো—এই গুহায় নরখাদকটা বাস করতো।

ক্যাপটেন আরফিন হুই বলে উঠলেন–ঠিক চলেছে জাভেদ, এই গুহায় ঐ নরখাদকটা বাস করতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নরখাদকটা এই দ্বীপে কি ভাবে এলো চিন্তার বিষয়। তবে আমার মনে হয় সে আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ......

হঠাৎ লুসি বলে উঠলো—বাবা, বাবা ঐ দেখো একটা মোটা বই...ঐ যে... আংগুল দিয়ে লুসি দেখিয়ে দিলো গুহার মধ্যে একটা পাথরখন্ডের ওপরে একটা বই রয়েছে।

ক্যাপটেন আরফিন হুই এগিয়ে গিয়ে বস্তুটি হাতে তুলে নিলেন এবং বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–এটা বই নয়–এটা ডায়রী। বহুদিন ব্যবহার না হওয়ায় ময়লা জমে এমন হয়েছে।

যারা গুহায় প্রবেশ করেছিলো তারা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো। সকলের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। যে নরখাদক তাদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিলো সেই নরখাদক কি তবে একজন সাধারণ মানুষ!

লুসি ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে বললোবাবা, ডায়রী ওটা?

হাঁ মা, এটা একটা ডায়রী। কিন্তু বড় নরম হয়ে উঠেছে কাগজগুলো... ক্যাপটেন আরফিন দুই ডায়রীখানা মেলে দেখতে লাগলেন। ফুল্লরা নরকংকালগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলো।

জাভেদ মরচে ধরা রাইফেলখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো। বহুদিন এটাতে হাত না পড়ায় একেবারে মরচে ধরে জমাট শক্ত হয়ে উঠেছে। ক্যাপটেন আরফিন হুই ডায়রীটা হাতে নিয়ে তাকালেন রাইফেলখানার দিকে। তার মুখমন্ডলে একটা বিরাট জানার বাসনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব যেন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

লুসি বললো–বাবা, তুমি ডায়রীখানা পড়তে পারো কিনা দেখো তো? আমাদের মনে হচ্ছে ডায়রীখানার মধ্যে আমরা নরখাদকের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবো।

হাঁ মা, তোমার কথা সত্য। আমরা এ ডায়রী থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো বলে আমার মনে হয়। তবে কাগজগুলো এতো নরম আর মচমচে হয়ে পড়েছে যে, হাত স্পর্শ করানো যাবে কিনা সন্দেহ। সত্যি আশ্চর্য, নরখাদক এত নরদেহ পেলো কোথা হতে। স্তূপাকার নরকংকালগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন ক্যাপটেন আরফিন হুই।

কারও মুখে কোনো কথা নেই, সবাই হতবাক বিস্মিত, সব যেন তাদের কাছে অদ্ভুত কান্ড বলে মনে হচ্ছে। নির্জন দ্বীপে এত গুলো মানুষকে হত্যা করে লোকটা খেয়েছে এটা কম বিস্ময়কর নয়।

ক্যাপটেন হুই ডায়রীখানা মেলে ধরলেন, আরও আশ্চর্য হলেন তিনি ডায়রীখানায় সুন্দর ইংরেজী ভাষায় লেখা আছে আমার জীবন কাহিনী—ডঃ ডাওনার্ড।

আমার জাহাজ এখন প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে। যাত্রাকাল হতে আজ পর্যন্ত আমরা বহু বিপদ পেরিয়ে এসেছি। আমার বাবার মুখে শুনেছিলাম মাথুন দ্বীপের কথা। তিনি বলতেন মাথুন দ্বীপে একটি সোনার খনি আছে। শুধু সোনা আর সোনা। কোনোক্রমে এ দ্বীপে পৌঁছতে পারলে তার জীবনে কোনো অভাব থাকবে না। কিন্তু বাবা বলতেন ঐ দ্বীপে মানুষ বা কোন জীবজন্তু নেই। মাথুন দ্বীপে কোনোদিন কোনো জাহাজ গিয়ে পৌঁছতে পারে না। মাথুন-এর কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে একটি ডুবুপর্বত আছে, ঐ পর্বতের মধ্যে একটি গুহায় অদ্ভুত ধরনের এক জীব বাস করে যার আকার ভয়ংকর এবং বিশাল। সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে থাকে সে সর্বক্ষণ, মাঝেমধ্যে সে মাথা উঁচু করে পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করে। সে নাকি বৃহৎ আকার তিমি এবং এই ধরনের জলীয় জীব খেয়ে জীবন ধারণ করে। কোনো জাহাজ বা কোনো জলযান যদি ভুলক্রমে মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই, জাহাজখানাকে অনায়াসে সে তলিয়ে দেয় এবং মানুষগুলোকে খেয়ে ফেলে। এটা ঐ ভয়ংকর জীবটার নেশা।

আমাদের জাহাজ যতই এগুচ্ছে ততই মনে একটা বিপদের আশঙ্কা জাগছে। বাবা বলেছিলেন মাধুনে যাবার জন্য আমি বহুবার তৈরি হয়েছি কিন্তু হয়ে ওঠেনি। জাহাজ গুছিয়ে নেওয়ার পর সঙ্গী-সাথীরা সবাই পিছিয়ে গেছে জীবনের ভয়ে। কারণ তারা জানে মাথুন দ্বীপে যাওয়া অসম্ভব। আজ অবধি কেউ ঐ দ্বীপে পৌঁছতে পারেনি। বাবার এ উক্তি আমার মনকে আরও নাড়া দিলো। একটা শপথ গ্রহণ করলাম নিজের মনে। বাবার ইচ্ছা আমাকেই পূর্ণ করতে হবে, যেমন করে তোক জীবন মরণ শপথ নিয়ে যাবোই আমি মাথুন দ্বীপে। জাহাজ ভর্তি করে সোনা নিয়ে আসবো, দেশের সবচেয়ে বড় ধনবান হবো আমি–ডঃ ডাওনা লর্ড।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই অনেক চেষ্টা এবং কষ্ট করে ডায়রীর লেখাগুলো পড়ছিলেন। ডায়রীর পাতাগুলো ধীরে ধীরে নাড়া-চাড়া করতে হচ্ছিলো তার। ডায়রীখানা তিনি এমন যত্ন সহকারে হাতের মধ্যে ধরেছিলেন যেন খুলে বা ছিঁড়ে না যায়।

লুসি আর অন্যান্য সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনছিলে না।

ডিরোমা রাইফেলখানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো।

জাভেদ কিন্তু ডায়রীর লেখাগুলো শুনছিলো না, সে অন্যদিকে ঘুরেফিরে ভালভাবে দেখছিলো। ফুল্লরাও জাভেদের পাশে পাশে এগুচ্ছিলো এবং দু'একটা প্রশ্ন করছিলো। সকলেই একটা দারুণ উল্কণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইকে লক্ষ্য করে বললো লুসি-বাবা, তুমি পড়ো কারণ ঐ ডায়রীখানার মধ্যে কি লেখা আছে আমরা জানতে চাই। তোমার বন্ধুর ডায়রী থেকে তুমি জানতে পেরেছিলে মাথুন দ্বীপ সম্বন্ধে। আর ডাঃ ডাওনা লর্ড তার বাবার ডায়রী থেকে। জেনেছিলেন। বাবা, নরখাদকটি তাহলে তোমার আমার মত একজন সভ্য মানুষ?

হাঁ মা, নরখাদটিই যে ডঃ লর্ড কিনা এটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিংবা ঐ নরকংকালগুলোর মধ্যেও থাকতে পারে উঃ লর্ডের কংকাল।

ঠিক বলছো বাবা, ডায়রীখানা না পড়া পর্যন্ত আমরা সঠিক কিছু অনুধাবন করতে পারছি না।

ক্যাপটেন হুই গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

লুসি এবং অন্যান্য সবাই ক্যাপৃটেন আরফিন হুইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে এলো। সকলের দৃষ্টি তার হস্তস্থিত ডায়রীখানার দিকে।

একটি পাথরখন্ডের উপরে বসলেন ক্যাপটেন আরফিন হই এবার তিনি ডায়রীখানা পুনরায় পড়তে শুরু করলেন–

আমার প্রচেষ্টা সার্থক হলো। আমার বন্ধু-বান্ধবদের খুব করে বোঝালাম। এক মাস দুমাস তারপর এক বছর দু'বছর এমনি করে কয়েক বছর ধরে নানাভাবে বুঝিয়ে তাদের রাজি করলাম। তখন দেখা গেলো চব্বিশজন লোক আমার সঙ্গে মাথুনদ্বীপে যাবার জন্য তৈরি হলো। আনন্দ আমার ধরছে না। আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হাজির হলাম বাবার সামনে। সব শুনে বাবার চোখ কপালে উঠলো। তিনি ভাবতেও পারেননি আমি মাথুন দ্বীপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। আমাকে নিয়ে বাবার অনেক আশা-ভরসা। আমাকে বাবা লেখাপড়া শিখিয়ে মস্তবড় একজন মানুষ হিসেবে তৈরি করেছেন। বাবা চাইলেন না আমি বাবার সে ইচ্ছাটা পূর্ণ করি।

কিন্তু বাবার কোনো আপত্তিই টিকলো না। আমার বন্ধু ক্যাপটেন ক্যালোরালোরী তার জাহাজখানা আমাকে ব্যবহার করতে দেবেন বলে রাজি হলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন বলে চিন্তাভাবনা করে নিয়েছেন।

বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সত্যি সত্যি একদিন আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে। আমরা চলেছি মাথুন দ্বীপের উদ্দেশ্যে।

লুসি বলে উঠলো–বাবা, এ যে ঠিক তোর নাবিক বন্ধুর ডায়রীর কাহিনীর মত……

হাঁ মা লুসি, কতকটা সেই রকমই লাগছে। শেষ দিকটা না জানি কত ভয়াবহ হবে ক্যাপটেন আরফিন হুই ডায়রীখানা পড়ছেন, অন্যরা স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনছে।

দীর্ঘ দিন ধরে আমরা প্রশান্ত সহাসাগর পাড়ি দিচ্ছি। মাটির সঙ্গে আমাদের কোনো সাক্ষাৎ নেই। আমার সঙ্গে প্রচুর খাবার নিয়েছি তাই খেয়ে জীবন ধারণ করছি। সমুদ্রের পানি পান করা সম্ভব নয়, তাই খাবার পানি কয়েক ড্রাম নিয়েছি সাথে।

অবসর সময় কাটানোর জন্য নানা রকম বাদ্যযন্ত্র এবং খেলাধূলার সরঞ্জাম নিয়েছি। খুব আমোদেই কাটছে আমাদের। তবে ভয়ও হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমরা মাথুন দ্বীপে পৌঁছতে পারবো কিনা। একবার নয় দু'বার আমরা সাইক্লোনের কবলে পড়েছি। জাহাজখানা রক্ষা পেয়েছে করুণাময়ের অসীম দয়ায়।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ফিরে যাই কিন্তু ক্যাপটেন ক্যালোরালোরী আমাকে সাহস যুগিয়ে চলেছেন। ক্যালো রালোরীর অফুরন্ত উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠ আমার মনকে সতেজ করে তুলছে। আমি একটুও তাই হতাশ হইনি।

ক্রমেই খাবার ফুরিয়ে আসছে। আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ছি। মাখুনদ্বীপ আমাদের চেনাজানা নয় তাই অনেক পথ ঘুরেফিরে আসতে সময় কেটে যাচ্ছে। আমাদের কাছে কোনো ম্যাপ নেই। বাবার মুখে শোনা পথ ধরে জাহাজখানা এগুচ্ছে। মাঝে মধ্যে আমরা পথ হারিয়ে ফেলছি।

একদিন আমরা হঠাৎ একটি দ্বীপের সন্ধান পেলাম। গভীর রাতে দূরে বহু দূরে একটি আলোকস্তম্ভ দেখে আমরা অনুমান করলাম নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপ হবে, তবে মাথুন দ্বীপ যে নয় তা সত্য। কারণ বাবা মুখে শুনেছি মাথুন দ্বীপে কোনো মানুষ বা জীবজন্তু নেই। এ কোন্ দ্বীপ যেখানে আলোকস্তম্ভ আছে এবং আলো জ্বালাবার জন্য মানুষ আছে?

আমরা রাতের অন্ধকারে আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। আমাদের মধ্যে সবাই খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। কারণ খাবার পানি এবং খাদ্য দুটোই শেষ হয়ে এসেছিলো। নিশ্চয়ই ঐ দ্বীপে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাবো।

আমাদের জাহাজের স্পীড বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

ঐ আলোকবিন্দু লক্ষ্য করে আমরা ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি। ক্রমে আলোর বলটা বড় হয়ে এলো। আমরা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চললাম আলোর বলটার দিকে।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমাদের জাহাজখানা আলোর বলটার নিকটে পৌঁছে গেলো। তখনও রাতের অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। আমরা দেখলাম কোনো দ্বীপ নয়, একটা জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আলোকটা সেই জাহাজের কোনো এক ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসছে।

সবার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। আমরা ভাবতেও পারিনি ওটা কোনো জাহাজের ক্যাবিনের আলো। মাঝসাগরে এমন স্থিরভাবে জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, জাহাজে কোনো লোকজন আছে বলে মনে হলো না। ঐ একটিমাত্র ক্যাবিনে আলো জ্বলছে আর সমস্ত জাহাজখানা অন্ধকারে আচ্ছন। ক্যাপটেন আমাকে বললো, বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। আমরা যা ভেবেছিলাম তা নয়। কোনো দ্বীপ বা কোনো আলোকস্তম্ভ নয়, একটি ভাসমান জাহাজ।

আমরা রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম। যদিও আমরা সমস্ত রাত আমাদের জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থেমে থাকা জাহাজখানার দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখলাম তবুও কিছু আন্দাজ করতে পারলাম না। এক সময় ভোর হলো। পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে আসতেই আমরা সজাগ হয়ে উঠলাম। ঠান্ডায় খোলা আকাশের নিচে জমে যাবার উপক্রম হয়েছিলো যদিও শরীরে আমাদের মোটা পশমী কোট আর মাথায় ক্যাপ ছিলো। সূর্যের আলো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে রূপালী চাঁদ বিছিয়ে দিলো।

আমরা তখন স্পষ্ট দেখতে পেলাম ঐ থেমে থাকা জাহাজখানার উপরে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে জাহাজখানার ভেতরের অংশ লক্ষ্য করতে লাগলাম।

থামলেন ক্যাপটেন আরফিন হুই। তার চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। তিনি তাকালেন কন্যা লুসির দিকে।

লুসি বললো–বাবা, আমার ভীষণ জানার বাসনা জাগছে। সব যেন কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে।

হাঁ ঠিক তাই সবই বিস্ময়কর বটে। বললেন ক্যাপটেন আরফিন হুই।

ডিরোমা হস্তস্থিত মরচে ধরা শক্ত রাইফেলখানা এক পাশে ঠেশ দিয়ে রেখে এগিয়ে এসেছে ক্যাপটেন আরফিন হুইয়ের পাশে। ডায়রীর কথাগুলো তার মনকেও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো। না জানি ঐ থেমে থাকা জাহাজখানার ভেতরে কি রহস্য আত্মগোপন করে আছে। বললো ডিরোমা–আমরা একেই এক বিভীষিকাময় রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছি, আমার ধৈর্য্য আর থাকছে না।

তোমরা যেমন অধৈর্য হয়ে উঠেছে আমিও ঠিক তাই। কথাগুলো বলে ক্যাপটেন আরফিন হুই আবার ডায়রীখানার পাতা অতি সাবধানে উল্টে চললেন।

যা দেখলাম তাতে আমাদের চক্ষুস্থির হলো। জাহাজের বিভিন্ন স্থানে যারা যেভাবে কর্মরত ছিলো ঠিক তেমনি ভাবে আছে। ক্যাপটেনের বন্ধু বললেন– নিশ্চয়ই ঐ জাহাজে এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য ঐ জাহাজখানা মারাত্নক কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। আমরা এবার আমাদের জাহাজ হতে সেই জাহাজে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু ঐ জাহাজে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার একজন সঙ্গী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমরা আশ্চর্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, অমন হা করে তাকিয়ে রইলে কেন এগিয়ে যাও। কিন্তু একটি কথাও সে উচ্চারণ করলো না। আমার বন্ধু ক্যাপটেন লোরী বললো–খবরদার কেউ ঐ জাহাজে অবতরণ করো না। তোমাদেরও ঐভাবে মৃত্যু ঘটবে। সমস্ত জাহাজখানা কারেন্ট সংযুক্ত হয়ে আছে। ভাই ডাওনা, তুমি একজন সঙ্গী হারালে।

আমার দু'চোখে তখন বিস্ময়, একটি কথাও বলতে পারলাম না। সব যেন গভীর রহস্যজালে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

আমিও স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলাম আমার সঙ্গী যে প্রথমে ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে থেমে। থাকা জাহাজখানায় অবতরণ করেছিলো। বেচারীর জীবন নেই তবুও সে তাকিয়ে আছে অসহায় চোখে হয়তো বা কিছু বলবে বলেই চেষ্টা নিচ্ছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বলা হলো না। আমাদের সময় অল্প কারণ খাবার ফুরিয়ে আসছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি জমিয়েছি তাই সমাধা করতে হবে। থেমে থাকা বিস্ময়কর জাহাজখানার রহস্য উদঘাটন করার সময় হলো না। শুধু বুঝতে পারলাম কোন কারণে সমস্ত জাহাজখানা কারেন্ট যুক্ত হয়ে পড়েছে। আরও একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করলাম–সেই বিস্ময়কর জাহাজখানা লৌহ পাত দ্বারা মোড়ানো। যার জন্য জাহাজটির সবাই একসঙ্গে প্রাণ হারিয়েছে। যে যেখানে যেমন অবস্থায় ছিলো ঠিক তেমনি আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদেরও একজন মূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে রইলো।

ওর জন্য দুঃখ হচ্ছিলো কিন্তু ওকে তুলে নেবার কোনো উপায় ছিলো না। আমরা ওকে অমনিভাবে রেখে ফিরে চললাম। ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম সেই অদ্ভুত জাহাজখানার দিকে।

সূর্যের আলোতে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। অনেক দূর এগিয়ে গিয়েও লক্ষ্য করলাম–আমাদের সঙ্গীটি অমনি উপরের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। বড় মায়া হচ্ছিলো ওকে একা রেখে যেতে, হু হু করে মনটা কেঁদে উঠলো।

তারপর দুটো দিন অতিবাহিত হলো। কেন যেন আমাদের সেই সঙ্গীটির কথা বার বার মনকে নাড়া দিচ্ছিলো। হয়তো আরও কত বিপদ আছে আমাদের সামনে কে জানে আরও কত জন প্রাণ হারাবে। আমি নিজেও বাচবো কিনা তাই বা কে বলতে পারে তবুও কেন যেন ওর কথা ভুলতে পারছিলাম না।

ভাবছিলাম এখনও কি ও অমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে হা করে দাঁড়িয়ে আছে? যেমন ঐ জাহাজে আরও অনেকজনকে দেখেছি।

ক্যাপটেন বন্ধু আমাকে অন্যমনস্ক দেখে বারকয়েক গালমন্দ করেছেন কেন এমন উদাসীন হলাম। বন্ধুর কথায় হাসি পেতে আমার, ঠিকই বলেছেন ক্যাপটেন বন্ধু। শেষ অবধি আমাদের অদৃষ্টে কি আছে তাইবা কে জানে।

একদিন আমরা মাথুন দ্বীপ দেখতে পেলাম। বাবার মুখে শোনা সেই অদ্ভুত দ্বীপ। খুশিতে আমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠলাম। আমরা আনন্দে অধীর হয়ে করতালি দিচ্ছি। সেই সামুদ্রিক অদ্ভুত ভয়ংকর জীবটা তাহলে আর আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো না। হয়তো বা এতোদিনে মৃত্যুবরণ করেছে জীবটা।

আমাদের সঙ্গে যারা ছিলো তারা সবাই নিশ্চিন্ত। কারণ আমরা মাথুন দ্বীপের একেবারে কাছাকাছি এসে গেছি। ভাগ্য বলতে হবে নইলে কোনো জাহাজ আজ পর্যন্ত মাথুন দ্বীপের সন্নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো না। যে কোন জাহাজ মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়তেই একটি ভীষণ আকার জীব জাহাজখানাকে খেলনা জাহাজের মত হাতের মুঠোয় তুলে টুকরো টুকরো করে ফেলে। জাহাজখানা বিনষ্ট হয়েই তার সঙ্গে সমস্ত যাত্রী প্রাণ হারায়। সলিল সমাধি হয় তাদের।

এতোক্ষণ লুসি নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো, এবার সে বলে উঠলো–বাবা, এ ডায়রীখানার লেখক যে সেই এই নরখাদক..

বললেন ক্যাপটেন আরফিন হুই–ডায়রীখানা পড়া শেষ করলে হয়তো সব জানতে পারবো। ডায়রীখানার শেষ দিকটা বেশ নষ্ট হয়ে গেছে।

তোমার যদি কষ্ট হয় তাহলে আমাকে দাও বাবা। আমি না হয় পড়তে চেষ্টা করি?

না মা, আমিই পারবোএকটু থেমে বললেন ক্যাপটেন হুই, তারপর পড়তে শুরু করলেন

আমরা মাথুনদ্বীপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বাবার মুখে যে বর্ণনা আমি শুনেছিলাম তাই দেখছি কাজেই আমার সব চিন্তার অবসান হলো। সবাই আমার সঙ্গী সাথীরা মিলে আনন্দধ্বনি করছি। আমার ক্যাপটেন বন্ধু আমার করমর্দন করে বললেন– বন্ধু তুমি জয়ী……কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেলো। আমাদের জাহাজখানা এক দিকে কাৎ হয়ে গেলো অকস্মাৎ। সমস্ত জাহাজ একপাশে কাৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গড়িয়ে পড়লাম। তেলের ড্রাম এবং পানির ড্রামগুলো সব গড়িয়ে গেলো একদিকে। কেউ কেউ ড্রামের আঘাতে আহত হলো। জাহাজের জিনিসগুলো গড়িয়ে পড়লো তার সঙ্গে অনেকেই ছিটকে পড়লো সমুদ্রে।

সবাই আমরা ভয়ে আর্তনাদ শুরু করে দিলাম। আমি আমার কাঁধে চামড়ার ব্যাগটা যা সব সময় আমার কাঁধে ঝোলানো থাকতো, যার মধ্যে আমার এই ডায়রীখানা ছিলো এবং কলম কালি ও প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সব থাকত, ওটা তখনও আমার কাঁধে আটকানো ছিলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম আমার সঙ্গীরা সব ডেকের রেলিংয়ে আটকে আছে। অনেকেই সাগরবক্ষে পড়ে গিয়ে সাঁতার কাটছে। আমি দেখলাম আমার পাশেই আমার এক সঙ্গীর রাইফেলখানা গড়া গড়ি খাচ্ছে। আমি ওটা অতিকষ্টে হাতের মুঠায় ধরে ফেললাম। কিন্তু আর কিছু ভাববার সময় পেলাম না। জাহাজখানা শূন্যে উঠে গেলো, সাগরবক্ষ হতে কিছুটা উপরে। তারপর ভীষণ একটা শব্দ। আমার কাঁধের বেল্টের সঙ্গে রাইফেলখানা বেঁধে ফেলেছি এই ভয়াবহ মুহূর্তেও।

আমি মনকে শক্ত করে নিয়েছি যেন, সংজ্ঞা না হারাই। সাগরে পড়লেও যেন মাথুনের মাটিতে পা রাখতে পারি এটাই হলো আমার শেষ চিন্তা। সঙ্গীদের কথা তখন ভাবনার সময় ছিলো না! মনে পড়লো বাবার কথা। তিনি বলেছিলেন, আজও সেই মাথুন দ্বীপে কোনো জাহাজ গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তুমিও পারবেনা ডাওনা কারণ মাথুনদ্বীপের সন্নিকটেই সেই ডুবুপর্বত যা প্রশান্ত মহাসাগরের তলে অবস্থিত। তারই কোনো এক গুহায় বাস করে এক বৃহৎ আকার জলজীব যার আকৃতি মানুষের মতোই।

আমাদের জাহাজখানা প্রচন্ড আওয়াজ করে সাগরে এসে পড়লো। কে কোথায় ছিটকে গেলো জানি না। আমি সাঁতার কাটতে কাটতে দেখলাম আমাদের প্রিয় জাহাজখানা একটি খেলনা জাহাজের মত কাৎ হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। আরও একটি ভয়ংকর দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, গভীর জলরাশির বুকে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলেছি তবুও এমন ভয়ংকর দৃশ্য আমি দেখলাম যা আমার জীবনের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে যদি আমি বেঁচে থাকি। দেখলাম বিরাট এবং মনুষ্য আকৃতির একটি জীব দাঁড়িয়ে আছে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে। তার হাতের মুঠায় পুতুলের মত আমাদের কোনো এক সঙ্গীকে দেখলাম, সে হাত পা ছুড়ছে সাগরের পানিতে আছড়ে পড়ার জন্য।

কিন্তু তখন নিজের জীবন রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে সাঁতার কাটছি। কাঁধে আমার প্রিয় ব্যাগ আর পিঠের সঙ্গে রাইফেল বাধা রয়েছে।

দূরে মাথুনদ্বীপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আমি সেইদিক লক্ষ্য করে সাঁতার কেটে চললাম। সঙ্গীসাথীরা কোথায় গেলো এ কথা ভাববার সময় নেই আমার। অবশ্য আমার সঙ্গীরা সকলেই সাঁতার জানতে খুব ভাল। অনেকেই ডুবুরী ছিলো, তারাও সাঁতার কেটে মাথুনের দিকে এগুচ্ছে আমি লক্ষ্য করলাম।

জীবটা আমাদের দিকে অগ্রাহ্যভরে তাকালো। ধরবার কোনো চেষ্টা করলো না, সে অর্ধ নিমজ্জিত জাহাজখানা পুনরায় তুলে নেওয়ার জন্য উবু হয়ে হাতড়াচ্ছে বলে মনে হলো। কিন্তু আমার ওসব দেখবার মত অবস্থা নয়। প্রচন্ড ঢেউ প্রতিহত করে আমাকে এগুতে হচ্ছিলো। আমার কাঁধে ব্যাগ এবং ভারী রাইফেল।

জানিনা আমার ভাগ্যে কি আছে।

আমি অতি কষ্টে, ভয়ংকর এক অবস্থার মধ্যে এক সময় আমার চির আকাঙিক্ষত দ্বীপে এসে পৌঁছে গেলাম। তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। মাটি-কাদা মাখা অবস্থায় মাথুনের মাটিতে পড়ে রইলাম বহুক্ষণ ধরে।

ভাগ্যিস তখন প্রখর রৌদ্র ছিলো তাই শরীরটা ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠলো। শক্ত হলো দেহটা, সংজ্ঞাহারার মতই হয়েছিলো। তারপর সংজ্ঞা ফিরে এলো যেন আমার।

চোখ মেলে তাকালাম, দেখলাম আমার অদূরে আর একজন উবু হয়ে পড়ে আছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগুলাম, মনে হলো লোকটা মরে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কাছে যেতেই বুঝলাম লোকটা মরে যায়নি সে জীবিত আছে। আমি তাকে চিনলাম, সে আমাদেরই একজন নাবিক।

আমি তাকে চিৎকার করে ডাকলাম কিন্তু কোনো জবাব সে দিলো না। আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, এই সেই মাপুন দ্বীপ যে দ্বীপের সন্ধানে কত লোক আজ কত দিন ধরে জীবনের সঙ্গে সগ্রাম করে চলেছিলাম। মাটির দিকে তাকিয়ে আনন্দে চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো আমার। চারদিকে সোনার কণিকা ছড়ানো রয়েছে, উহ্ কি যে খুশি লাগছে আমার!

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম।

কিছুটা এগুতেই দেখলাম আরেকজন, তাকে দেখবামাত্র খুশিতে বলে উঠলেন– ক্যাপটেন লোরী তুমিও তা হলে এসে গেছে বন্ধু।

ক্যাপ্টেন লারীও ধুলো কাদা মাখা অবস্থায় আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার অবস্থাও আমার মত। বেচারা সাঁতার কেটে মাথুনে এসে পৌঁছতে পেরেছে।

জাহাজখানা ভাগ্যক্রমে মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি এসে সেই ভয়ংকর জলজীবের কবলে পড়েছিলো এবং জাহাজখানা বিনষ্ট হয়েছিলো। তাই আমরা সাগরের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করেও মাথুন দ্বীপে এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।

সংজ্ঞাহীন নাবিকটির সংজ্ঞা ফিরে এলো। সংখ্যায় তিন জন হলাম। জাহাজ এবং অনেক জিনিসপত্র ও সঙ্গী সাথী হারিয়েও আমাদের আনন্দ ধরছে না। কারণ আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পেরেছি। সেদিন ফিরে যাবার কথা তেমন করে মনে পড়ছিলো না। শুধু সোনা আর মাটি আমাদের দু'নয়নকে পরিতৃপ্ত করে তুলছিলো। বাবার মুখে যা শুনেছিলাম তাই দেখতে পাচ্ছি। আরও কয়েকজন সঙ্গীকে আমরা খুঁজে পেলাম, তারাও আমাদের মত সাঁতার কেটে কেটে এসে পৌঁছেছে। চব্বিশজন সঙ্গী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, মাথুন দ্বীপে আমি পেলাম উনিশজনকে আর বাকি ক'জন প্রাণ হারিয়েছে।

কয়েকজনকে আমরা পেলাম বটে কিন্তু মাথুনে পৌঁছানোর পর আরও দুজন মৃত্যুবরণ করলো। তবে সবাইকে আমরা একই জায়গায় পেলাম না। দ্বীপটির বিভিন্ন অংশে দেখা পেলাম আমাদের কয়েকজনকে। সবচেয়ে আমরা আশ্চর্য হলাম মাথুন দ্বীপে একটি প্রাণীও নজরে পড়ছে না।

আমরা কিছু সুস্থ এখন। খাবার সন্ধানে দ্বীপটার বুকে সন্ধান চালালাম। শুধু নানা জাতীয় ফলমুল ছাড়া আর কোনো কিছু নেই, থাকবার কথাও নয়। বাবার মুখেই শুনেছিলাম মাথুন দ্বীপে কোনো কিছু নেই, শুধু আছে স্বর্ণ মেশানো মাটি। বাবার কথা যে মিথ্যা নয় তা বেশ বুঝতে পারলাম।

আমরা বনজঙ্গল পেরিয়ে মাথুন দ্বীপের একপাশে পর্বতমালায় উপস্থিত হলাম। এখানে শীত কিছু কম মনে হলো। একটি গুহা আমরা বেছে নিলাম, যেখানে রাত কাটানো সম্ভব হবে।

নির্জন দ্বীপে আমরা কয়েকজন প্রাণী। শুরু হলো আমাদের স্বর্ণ সংগ্রহ। এত দুঃখ কষ্ট সব ভুলে গেলাম। পাথর ঠুকে শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে আলো সৃষ্টি করতাম। সেই আলো রাতে আমাদের জীবনকে আলোকিত করতো। দিনে গাছের ফল খেয়ে জীবন রক্ষা করতাম। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সমস্যা হলো পানির। সমুদ্রের পানি নোনা কাজেই পান করা সম্ভব নয়।

ক্রমে পানির পিপাসা আমাদের মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিলো। যতই ফলমূল খাই না কেন পানির অভাবে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লো।

ফলমূল খেয়েও আর আমাদের তৃপ্তি মিটছে না। ক্রমেই ভেতরটা যেন শুষ্ক হয়ে উঠলো। প্রতিদিন হতাশা আর ক্লান্তিবোধ করতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে শরীর দুর্বল হয়ে আসছে।

আমার মাথার মধ্যে একটা বাসনা ঘুরপাক খাচ্ছে যেমন করে হোক আমাকে বাঁচতে হবে এবং একদিন আমি ফিরে যাবো নিজের দেশে। আমার সহকারীকে নিয়ে সোনা আর মুক্তা সগ্রহ করতে লাগলাম। মুক্তা গুলো সমুদ্রের ধারে বালুকারাশির মধ্যে পেতাম তবে অনেক সন্ধান করে তবেই মুক্তা পেয়েছি। সবার অগোচরে সোনা আর মুক্তাগুলো সরিয়ে রাখতাম। ওরা কেউ জানে না কোথায় এগুলো আমি সরিয়ে রাখছি। আমার গুহার ওপাশে দক্ষিণে একটি ছোট্ট গুহা

আছে, যার পথ খুঁজে বের করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু আমি জানি সে গুহার পথ কোথায়। যদিও আমার সঙ্গীদের সঙ্গে একাত্ন হয়ে কাজ করতাম তবুও আমি পূর্ণভাবে কাউকে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। আমাদের দিনগুলো অসহনীয় হয়ে উঠছে ক্রমান্বয়ে। দাড়ি গোঁফ আর মাথার চুল বাড়াতে শুরু করেছে দারুণভাবে, জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে স্থানে স্থানে। ময়লা আর দুর্গন্ধ বের হচ্ছে নিজেদের শরীর থেকে।

আমি দল ছেড়ে অনেকদূর এসে পড়েছি। আমার সঙ্গে ছিলো খালাসি জবরু। দুজন হাটছিলাম। ক্ষুধা পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠেছে। আমরা মুক্তার খোঁজে বেরিয়েছি। বহু সোনা আর মুক্তা আমরা সংগ্রহ করেছি। জানি না সে সব আমাদের জীবনে কোনো কাজে আসবে কিনা তবু আকাঙ্খার শেষ নেই।

কিন্তু আজ আর সহ্য করতে পারছি না। ক্ষুধা আর পিপাসা আমকে হিংস্র করে তুললো। একটা বৃক্ষের নিচে এসে বসলাম আমরা দুজন-আমি আমার সঙ্গী জবরু। আমার মতই তারও অবস্থা, হাঁটবার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে তার। দু'একটি কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু সে কোনো জবাব দিতে পারছে না। আমি তাকে আর প্রশ্ন না করে কাজের নির্দেশ দিলাম তবুও সে চুপ করে রইলো।

ভীষণ রাগ হলো, আমি আমার রাইফেলের বাট দিয়ে তা মাথায় আঘাত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাৎ হয়ে পড়ে গেলো জবরু। এতো জোরে আঘাত করেছিলাম যে সে টু শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারলো না। আমি দেখলাম তার মাথা ফেটে দু'খানা হয়ে গেছে। মাথা থেকে মগজ বেরিয়ে এসেছে, রক্তে লালে লাল হয়ে উঠলো সেখানকার শুকনো মাটি।

বিনা কারণে হত্যা করলাম আমার সঙ্গীটিকে। একেবারে বিনা কারণে বলা যায়। কিন্তু বেশি ভাববার মত মনের অবস্থা তখন ছিলোনা আমার। ক্ষুধা পিপাসায় আমি পশু বনে গেছি। কিছুতেই পারলাম না সহ্য করতে। জবরুর মাথা থেকে মগজ গড়িয়ে পড়ছিলো। আমি দুহাতে তুলে খেতে শুরু করলাম। মানুষের রক্ত এতো স্বাদ আমি পূর্বে জানতাম না!

সেদিনের পর থেকে আর এক নেশায় পেয়ে বসলো। আমি এখন মানুষের মাংসের স্বাদ পেয়েছি। কয়েকদিন পর পর আমি এক একজন সঙ্গীকে সকলের

অজ্ঞাতে হত্যা করে খেতে লাগলাম।

তারপর একদিন দেখলাম আমার সঙ্গী মাত্র আর একজন রয়েছে, ক্যাপটেন লোরী।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে আছি আমরা দু'জন। কারও চোখে ঘুম নেই। আমি নরমাংস খাবার আশায় প্রহর গুণছি। ক্যাপটেন লোরীর নিদ্রা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করবো। আর জোসেফ ভাবছে তার সঙ্গী সাথীরা সবাই কোথায় গেলো। অবশ্য লোরীর মনের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে সে এতোদিনে ধরে ফেলতে তার সঙ্গীরা কোথায় গেলো, কি হলো তার। কয়েকদিন পর পর যখন একজন করে নিখোঁজ হতে লাগলো তখনও সে টের পায়নি। আমাকে সে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করছে, ডাওনা লর্ড, তুমি কি বলতে পারোনা আমাদের সঙ্গীসাথীরা গেলো কোথায়?

বলেছিলাম আমি, হয়তো কোনো জীব-জানোয়ারের পেটে গেছে.....

আমার কথা সে বিশ্বাস করতে পারেনি, বলেছে এ দ্বীপে কোনো জীবজন্তু আজও নজরে পড়লো না আর তুমি বলছে তারা কোনো জীবজন্তুর পেটে গেছে......ক্যাপটেন লোরী কতদিন আমার শরীরে, ছেঁড়া জামাকাপড়ে রক্তের ছাপ দেখেছে। কতদিন সে আমাদের গুহার অদূরে নরকংকাল পড়ে থাকতে দেখেছে তবু সে বোঝেনি কিছু। একে লোকটা ছিলো সরল, তারপর বিস্ময়কর দ্বীপ তাকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো। তারপর ছিলো ক্ষুধার জ্বালা। আমারই মত সে ক্ষুধার্ত অথচ সে ফলমূল খেয়ে বেঁচে আছে। আজকাল ফলমূল আর বেশি নজরে পড়ে না কারণ আমার সঙ্গী সাথীরা দারুণ ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত ছিলো, তারা ফলমূলের মুকুল পর্যন্ত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতো।

আমি কিন্তু এখন মোটেই ক্ষুধার্ত নই।

নরমাংস আমাকে আরও সতেজ আর শক্তিশালী করে তুলেছে। আমার দেহে এখন অসম্ভব শক্তি। মাথার চুল-দাড়ি-গোঁফ আর আংগুলের নখগুলো ভীষণ শক্ত হয়ে উঠেছে। দিন দিন নরমাংস আমাকে হিংস্র করে তুলেছে। তাকিয়ে দেখলাম ক্যাপটেন লোরী অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। অগ্নিকুন্ডটা জ্বলে জ্বলে এখন প্রায় নিভে এসেছে। এই সুযোগ আমি হারাতে চাই না......ক্যাপটেন জোসেফ নিশ্চিন্ত আর ক্লান্ত, তার গলাটা টিপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে একটা কুক করে শব্দ

হলো মাত্র। তারপর আমার রাজ্য......মাথুন দ্বীপে আমি একা সঙ্গীহীন। কদিন ধরে ক্যাপৃটেন লোরীর মাংস খেলাম। তারপর একদিন শেষ হয়ে গেলো ক্যাপটেন লোরীর দেহের অবশিষ্ট অংশটুকু......

ক্যাপটেন আরফিন দুই থামলেন এবং কন্যা মিস লুসির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন–এমন কাহিনী আমি কোনোদিন শুনবো ভাবিনি মা। তবে আর কিছুদিন আমরা এ অবস্থায় থাকলে ডঃ ডাওনা লর্গের মতই হিংস্র হয়ে উঠবোনয় মৃত্যুবরণ করবো।

চিন্তিতভাবে বললে লুসি-বাবা, তোমার শরীর বড্ড অবসন্ন। আমার ভয় তোমাকে নিয়ে।

ক্যাপটেন আরফিন হইয়ের হাতে তখনও ডায়রীখানা ধরা আছে। বললেন তিনি–মা, তুমি আমাকে নিয়ে ভেবো না। ডায়রীখানা অত্যন্ত মূল্যবান এটা তোমার কাছে যত্ন করে রেখে দাও।

বলল লুসিওর বেশি আর পড়া সম্ভব হলো না বাবা?

না মা, বড় মচমচে হয়ে গেছে পাতাগুলো। ঐটুকু পড়তে গিয়ে আমার অনেক বিলম্ব হলো। তবে অনেক কিছু জানতে পারলাম, যা কোনোদিন আমার জানা ছিলো না। ঐ দেখো রাইফেলখানা কেমন মরচে পড়ে গেছে, যতদিন ওটা ব্যবহার করেনি, তারপর ডায়রীও আর বেশীদূর এগোয়নি......ক্যাপটেন আরফিন উঠে পড়লেন। সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন– এসো তোমরা আমার সঙ্গে। ডঃ ডাওনার সেই মণি-মুক্তা এবং স্বর্ণগুহা খুঁজে বের করি....এসো জাভেদ, ফুল্লরা তোমরাও এসো।

লুসি ফুল্লরার হাত ধরে বললো–চলো বোন।

জাভেদ অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

ডঃ ডাওনা নরখাদকের মৃতদেহটা পড়ে রইলো সেখানে।

ক্যাপটেন আরফিন দুই একবার তাকিয়ে দেখলেন ওদিকে।

*

জানো মনিরা আমরা এখন কোথায়? বললো বনহুর।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললো–অজানা কোনো বন্দীখানায়।

বন্দীখানা তো বটেই তবে গভীর সাগরতলে কোনো এক ডুবন্ত পর্বতের গুহায়।

মনিরা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে বলে–যত বিপদ আছে মাথা পেতে নেবো ওগো, তুমি আছো আমার পাশে।

হয়তো এই দুর্গম বন্দীশালায় আমাদের মৃত্যুও হতে পারে।

একটুও দুঃখ পাবো না। যেদিন তুমি আমার পাশে এলে সেদিন আমি মুক্তি পেয়েছি। ওরা নির্বোধ জানে না, তোমাকে পেলে আমার কাছে সব কিছুই খুশীর। তোমাকে পাশে পেলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

বনহুর মনিরাকে আরও গভীর আবেগে বুকে টেনে নিয়ে বললো–মনিরা, ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে আমি আমার ডুবুজাহাজে ফিরে যাবো। রহমান অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে সাগরতলে অপেক্ষা করছে।

বললো মনিরাকে তোমাকে আমার সন্ধান বলেছিলো? তুমি কেমন করে সেখানে গেলে? সত্যি তুমি যদি না গিয়ে পৌঁছতে তাহলে আমি চির অন্ধ হয়ে যেতাম। আর কোনোদিন তোমাকে দেখতে পেতাম না।...

মনিরা চুপ, একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ।

বনহুর আর মনিরা অন্ধকারে একজনের কাছ থেকে আরেকজন বসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা আলোর ছটা তাদের চোখেমুখে এসে পড়লো। প্রথমে চোখ ধাধিয়ে গেলো তাদের।

দেখলো দু'জন মানুষ তাদের হাতে অত্যন্ত পাওয়ার ফুল টর্চ, দেহে তাদের ডুবুরী ড্রেস। বললো একজন–এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না, উঠে পড়া বনহুর।

বনহুর আর মনিরা অবাক হলো—এ কণ্ঠস্বর পুরুষের নয় নারীর। সমস্ত দেহ কালো ড্রেসে ঢাকা।

নারীমূর্তিটিকে বনহুর চিনতে পারলো, এই নারীমূর্তিই একদিন তাকে দুর্গম বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করেছিলো। কিন্তু কে এই নারীমূর্তি যার পরিচয় বনহুর আজও জানে না।

নারীমূর্তি বললো—অনেক কষ্ট করে তবেই তোমাদের সন্ধান পেলাম। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না, এসো মনিরা…অদ্ভুত নারীমূর্তি মনিরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

যদিও মনিরার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে তবুও সে নারীমূর্তির হাত ধরলো।

ততক্ষণে বনহুর উঠে দাঁড়িয়েছে।

নারীমূর্তি এবং অপরজন দু'হাতে দুটি ডুবুরী ড্রেস এনেছিলো। তারা এবার সেই অদ্ভুত ড্রেস বনহুর আর মনিরাকে পরতে বললো।

জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন সে ডুবন্ত গুহাটি।

বনহুর আর মনিরা বিস্ময়কর নারীমূর্তির দেয়া পোশাক পরে নিলো, নিচে রইলো তাদের নিজস্ব পোশাক।

নারীমূর্তি সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করে বললো—ডিনামাইট ঠিকমত বসিয়ে দিয়েছো তো?

বললো সঙ্গীটি-হাঁ, আপনার আদেশমত কাজ করেছি।

এবার নারীমূর্তি বললো–আর মোটেই এখানে বিলম্ব করা ঠিক হবে না, কারণ আমি এই ডুবন্ত বন্দীশালাটিকে সমূলে ধ্বংস করে দেবো। ডিনামাইট বসানো হয়েছে, আর বিলম্ব করা যাবে না, চলো বনহুর।

নারীমূর্তি একটি চক্রাকার হ্যান্ডেল ঘুরাতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে পাথর সরে একটি সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো।

বনহুর মনিরার হাত ধরে বললো–এসো মনিরা।

মনিরা স্বামীর হাত মুঠায় চেপে ধরলো, যদিও নানা প্রশ্ন তার মনে উদয় হচ্ছিলো তবুও সে নীরবে এগিয়ে চললো। এমন ঘটনা তার জীবনে এই প্রথম নয়। আরও বহুবার তাকে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নূর জন্মাবার পর তার জীবনে একবার নেমে এসেছিলো এক মহা ভয়াবহ অভিশাপ। সেই ভয়ংকর অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছিলো বনহুর। তারপর আরও কত বার কত বিপদ এসেছে তার জীবনে সব আল্লাহর মেহেরবানিতে উদ্ধার পেয়েছে তাও স্বামী বনহুরের দ্বারাই। কিন্তু কে এই নারীমূর্তি যে আজ তার স্বামীকেও উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছে......

কি ভাবছো মনিরা, তাড়াতাড়ি এসো। বললো বনহুর।

বেশ কিছুটা এগুনোর পর তারা সমুদ্রের জলরাশি দেখতে পেলো। এবার বনহুর মনিরাকে তার মুখে অক্সিজেন মুখোশ পরিয়ে দিলো এবং তাকে সাঁতার কাটার জন্য প্রস্তুত। হতে বললো।

বনহুরও মুখোশ পরে নিলো।

অদ্ভুত ড্রেস পরিহিতা নারীমূর্তির দেওয়া ডুবুরী ড্রেসের সঙ্গেই ছিলো অক্সিজেনভরা মুখোস।

তাড়াতাড়ি পরে নিয়ে সাগরের পানিতে ডুবসাঁতার দিয়ে এগুচ্ছে। বনহুর শুনতে পেলো নারীকণ্ঠের আওয়াজ, বললো—অত্যন্ত দ্রুত চলো বনহুর, নইলে আমাদের সকলের অবস্থা শোচনীয় হবে। ডিনামাইট বার্ষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাগরতল প্রকম্পিত হবে এবং আমরা কেউ রেহাই পাবো না.....

বনহুর বুঝতে পারলো তার অক্সিজেন মুখোসের মধ্যেই রয়েছে ওয়্যারলেস যন্ত্র। সেই কারণেই শুনতে পাচ্ছে সে সমুদ্রের গভীর জলরাশির তলদেশেরও অপর ব্যক্তির কণ্ঠস্বর। ঐ নারীমূর্তির মুখোসের অন্তরালেও আছে কোনো যন্ত্র যার দ্বারা গভীর পানির তলদেশে নিজের কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দিচ্ছে। যে কণ্ঠস্বর বনহুরের ডুবুরী ড্রেসের মধ্যেও কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে।

বনহুর আরও শুনতে পেলো নারীকণ্ঠের আওয়াজ-আমাকে অনুসরণ করো। তোমার ডুবুজাহাজ এখনও অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।.......

গভীর পানির তলদেশে তাই নারী কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে তার কানে প্রবেশ করছিলো। মুখোসের মধ্যেও দীপ্ত হয়ে উঠলো বনহুরের মুখমন্ডল, সে বেশ বুঝতে পারলো এই নারীমূর্তিই তাকে আরও একদিন গভীর সাগরতলে বি, কে, চৌধুরীর কুচক্রী অনুচরদের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলো, এত বিপদেও তার মনে জাগলো সে এই নারী।

মনিরা বনহুরের কণ্ঠদেশ শক্ত করে ধরে আছে। প্রতিটি ডুবরী ড্রেসের পিঠে ছিলো স্পীডে চলার ক্ষুদ্র মেশিন। নারীমূর্তির ইংগিতে মেশিনগুলো চালু করে দেওয়া হয়েছিলো তাই অত্যন্ত স্পীডে এগিয়ে চললো তারা সাঁতার কেটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা অনেক দূরে চলে এলো।

গভীর পানির তলদেশে এমন একটা ডুবু পর্বত ছিলো যার মধ্যে বি, কে চৌধুরী কৌশলে তার গোপন আড্ডাখানা এবং একটি দুর্গম বন্দীশালা তৈরি করে নিয়েছিলো।

বনহুরকে আটক করাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য। তার জীবনের সাধনা তাকে আটক করা। বনহুরকে কেউ কোনোদিন বন্দী করে ধরে রাখতে পারেনি, এমনকি হাঙ্গেরী কারাগারও তাকে আটক রাখতে সক্ষম হয়নি। তাই মিঃ চৌধুরী সাধুতার মুখোস পরে জনসমাজে নেতৃত্ব দিয়ে একজন নরপিশাচ ছিলো।

তার ছোট্ট একটি ডুবু সাবমেরিন ছিলো। ঐ সাবমেরিনে সে এই বিস্ময়কর আড়ডাখানায় যাওয়া-আসা করতো। গভীর সাগর তলে একটি সুড়ঙ্গপথ। সেই সুড়ঙ্গপথের সন্ধান কেউ জানতো না।

বহুদূর এগিয়ে আসার পর হঠাৎ ভয়ংকর একটা শব্দ হলো তার সঙ্গে সমুদ্রের জলরাশি ভীষণভাবে আলোড়িত হলো।

বনহুরের ডুবু জাহাজ এবার তাদের নজরে এসে গেছে।

শুনতে পেলো বনহুর নারীকণ্ঠ যাও বনহুর তোমার স্ত্রী-সহ তোমার ডুবুজাহাজে ফিরে যাও। ডিনামাইট বাষ্ট হয়ে ডুবু পর্বতমালার গুপ্ত বন্দীশালা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

রহমান জাহাজে বসে টেলিভিশন পর্দায় দেখছিলো, চিনতে পারে ডুবুরী পোশাকে বনহুরকে। অবশ্য বনহুর তার নিজস্ব ডুবুরী পোশাকে সমুদ্রতলে ডুব দিয়েছিলো এ ড্রেস সে ড্রেস নয়। রহমান ডুবু জাহাজের তলদেশের সুড়ঙ্গমুখ খুলে দেবার জন্য নির্দেশ দিলো।

*

রহমান!

বলুন সর্দার?

একবার নয় সে কয়েকবার আমাকে ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। জানিনা কে এই বিস্ময়কর নারী?

রহমান বললো–আমরাও ভীষণ জানতে ইচ্ছা হচ্ছে কে এই নারী? যার ক্ষমতা অসীম……

হাঁ রহমান, সত্যি আমি তার বুদ্ধি কৌশল দেখে শুধু বিস্মিত হইনি। একেবারে সম্ভিত হয়ে গেছি। সে কেমন করে জানলো আমাকে মনিরা সহ-কৌশলে গভীর সাগরতলে দুর্গম একবন্দী গুহায় আটক করে রাখা হয়েছে।

আমরা সেদিনও অবাক কম হইনি যেদিন আপনাকে ডুবু জাহাজের নিকটে পৌঁছে দিয়ে সে গভীর সাগরতলে আরও গভীরে তলিয়ে গেলো।

বনহুর আর রহমানের কথা হচ্ছিলো এমন সময় মনিরা এসে দাঁড়ালো সেখানে।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে সরে গেলে সেখান থেকে।

বনহুর দাঁড়িয়েছিলো, দৃষ্টি ছিলো তার কাঁচের শাশী দিয়ে সমুদ্রের তলদেশে। নানাজাতীয় সামুদ্রিক জলজীব আর অদ্ভুত অদ্ভুত গাছগাছাড়া, জলীয় উদ্ভিদগুলোর দিকে।

মনিরার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো বনহুর—-এসো মনিরা! দেখো সমুদ্রের তলদেশেও একটি জগৎ আছে।

মনিরা স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখতে লাগলো সমুদ্রতলের বিস্ময়কর জীব আর উদ্ভিদগুলো কত প্রবাল জমে জমে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে! কত রঙের মাছ যা কোনোদিন মনিরা দেখেনি।

অবাক হয়ে দেখে মনিরা।

বনহুর বললো–কেমন লাগছে তোমার?

যেখানে তুমি আছো সেখানে আমার অনন্ত সুখ। তুমি আমার পাশে থাকলে আমি মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারি।

মনিরা!

হাঁ।

সত্যি বলছো মনিরা

তবে কি মিথ্যা বলছি?

সারাটা জীবন তোমার ব্যথা বেদনায় ভরিয়ে দিয়েছি। মিঃ বি, কে, চৌধুরী আমাকে পাকড়াও করবার জন্য তোমার ওপর কত নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। তোমার সে ব্যথা, সে কষ্ট আমি কোনোদিন মুছে দিতে পারবো না। তুমি আমাকে অভিসম্পাত দাও মনিরা।

ছি! মনিরা স্বামীর মুখেহাত চাপা দেয়, তারপর বলে–তুমি তো জানো আমার জীবন তোমার জন্য, ওসব আর বলবে না।

মনিরা, আমরা কিছুদিনের মধ্যেই কান্দাই পৌঁছে যাবো। নূর তোমার সন্ধানে উম্মাদ হয়ে উঠেছে। বড় ছেলেমানুষ, কখন কোন ভুল করে বিপদে পা দেবে কে জানে।

হাঁ, আমারও তাই চিন্তা। নূর নিশ্চয়ই সন্ধান করে ফিরছে কোথায় সেই নরপশু বি, কে, চৌধুরী, আর কোথায় তারা তার মাকে বন্দী করে রেখেছে।

তুমি ভেবো না মনিরা, কিছুদিনের মধ্যেই তোমাকে কান্দাই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো।

সেকি, তুমি যাবে না আমার সঙ্গে? বললো মনিরা।

বনহুর বললো–হয়তো এখন যাওয়া সম্ভব হবে না।

কারণ? গম্ভীর কণ্ঠে বললো মনিরা।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বললো—মনিরা, কিছু কাজ আমার এখনও বাকি আছে।

শুধু কাজ আর কাজ–কি কাজ বলো?

একটু হেসে বললো বনহুর–সঠিক করে কোনো কাজের কথা এখন আমি তোমাকে জানাতে পারছি না মনিরা।

যদি সেই বিস্ময়কর নারী তোমাকে এই মুহূর্তে মুক্ত করে না আনতো? তাহলে কোথায় থাকতো তোমার কাজ?

সে কথা অবশ্য সত্যি!...কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে বনহুর।

মনিরা বলে–বুঝতে পারছি সেই নারীটির কথা এখন তোমার স্মরণ হয়েছে! জানি সে যেই হোক তোমাকে সে ভালবাসে আর ভালবাসে বলেই তোমাকে সে বারবার ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছে।

বনহুর ক্যাবিনের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর বললো–থামলে কেনো বলো?

এবার তুমি তার সন্ধানে বেরুবে এবং এটাই তোমার এখন প্রধান কাজ।

মনিরা, সে কথা অবশ্য সত্য কিন্তু তার সন্ধানের চেয়েও আর দুজনকে আমার খুঁজে বের করতে হচ্ছে। কিন্তু এখন জানতে চেও না তারা কারা।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে তুমি সেই নারীও তার সঙ্গীটির সন্ধান ছাড়া আর কার সন্ধান করবে?

এবার বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, তারপর বললো—কে ঐ নারী তা জানবার জন্য আমার তেমন উৎসাহ নেই তবে সে কে তা আমার জানতে হবে।

তার সঙ্গে জানতে হবে সে তোমায় ভালবাসে কিনা, তাই না?

মনিরা, তোমার এ সন্দেহ একেবারে অমূলক। ভালবাসা নিয়ে ভাববার সময় আমার কবে হয়েছে বলো? তোমার ভালবাসারই মূল্য দিতে পারলাম না আজও। যাক ওসব কথা, শোন মনিরা–তোমাকে রহমান পৌঁছে দেবে আমার সাবমেরিন নিয়ে। কোনো অসুবিধা হবে না।

বেশ তো আছি। আমি থাকলে তোমার বুঝি অসুবিধা হয়? অভিমানভরা কণ্ঠে বললো মনিরা।

বনহুর মনিরকে টেনে নিলো কাছে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো—মনিরা যা তোমার মুখে আসে তাই বলো। তুমি আমার পাশে থাকলে খুব ভাল লাগে কিন্তু আমার পাশে, চারদিক ঘিরে অনেক বিপদ। আমি চাই না মনিরা তুমি আবার কোনো বিপদের সম্মুখীন হও।

তবে বলো তুমি সমুদ্রের গভীরে কাকে খুঁজছো! কারা তারা?

বলেছি তো আজ নয় বলবো পরে। মনিরা, আমি বারবার তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। কারণ আমি অপরাধী তোমার কাছে, নূরের কাছে, মায়ের কাছে। আমি পারিনি মায়ের সন্তান হিসেবে আমার কর্তব্য পালন করতে পারিনি স্বামীর কর্তব্য পালন করতে, পারিনি পিতার কর্তব্য পালনে…

চুপ করো, ওসব আমি শুনতে চাই না। তুমি তো শুধু মায়ের সন্তান হিসেবে জন্মাওনি! তুমি তো কোনো নারীর স্বামী হতে চাওনি! তোমার সন্তান শুধু নূর নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তোমার সন্তান, তোমার ভাই, তোমার বোন….

মনিরা!

হাঁ আমি জানি। আর সে কারণেই তোমাকে তোমার কাজে কোনোদিন বাধা দেইনি। তুমি যা ভাল বোঝো তাই করো।

রাগ করলে?

না।

তবে মুখ ফিরিয়ে নিলে কেনো মনিরা? এসো কাছে এসো।

ছেড়ে দাও।

না ছাড়বো না, আগে বলতে হবে তুমি আমার ওপর রাগ করোনি?

না গো না। যে মানুষ সে তোমার ওপর কোনোদিন রাগ করতে পারে? মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখে।

এমন সময় ওয়্যারলেসে ভেসে আসে রহমানের গলা......একটি ডুবন্ত পর্বতমালা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।......আমাদের ডুবুজাহাজ সেই ডুবন্ত পর্বতমালা হতে প্রায় তেরোশ মাইল দূরে রয়েছে...

বনহুর মনিরাকে বাহুমুক্ত করে সোজা ওয়্যারলেস যন্ত্রের সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো সে-রহমান, আমাদের জাহাজখানাকে ঐ ডুবন্ত পর্বতমালার দিকে নিয়ে চলো......নিশ্চয়ই ঐ ডুবন্ত পর্বতমালা রহস্যময়......

রহমানের গলা শোনা যায়......আবার কোনো নতুন বিপদের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব নয়.......ডুবন্ত পর্বতটা কিছুটা বিস্ময়কর...

...তোমাকে বললাম নিয়ে চলো...

বৌরাণী সঙ্গে আছেন, কোনো বিপদ এলে...

...সব বিপদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে সে রাজি তোমরা এগিয়ে চলো...কিন্তু সাবধান, কোনো প্রবল পাহাড়ে জাহাজ ধাক্কা না খায়...

..হা সর্দার, এদিকে বহু প্রবাল পর্বত পরিলক্ষিত হচ্ছে .....

বনহুর ফিরে এলো মনিরার পাশে, বললো—ফিরে যাওয়া এখন হলো না মনিরা। আমাদের ডুবুজাহাজখানা ভুলপথে অগ্রসর হয়ে কোনো ডুবন্ত পর্বতমালার কাছাকাছি এসে পড়েছে।

তাহলে উপায়?

সব তো শুনলে মনিরা। দস্যুপত্নী হয়ে ভয় পেলে চলবে না। তাছাড়া তুমি একজন খ্যাতনামা ডিটেকটিভ এর জননী……

যাও ঠাট্টা করোনা।

মোটই ঠাট্টা করছি না মনিরা। জানি না কি ভাগ্যে আছে।

কি আর থাকবে, হয়তো সেই নারীর আবার সাক্ষাৎ মিলবে। এবার কিন্তু পালাতে দেবে না।

দেখো দেখো মনিরা কি, ভয়ংকর একটি ডুবন্ত সাপ। ঐ দেখো……

সামনে পুরু কাঁচের শাশী দিয়ে দেখলো মনিরা।

একটা বিশালকায় সর্পরাজ একটি তিমি মাছকে গ্রাস করছে। অর্ধেকটা তিমি সর্পরাজের মুখ গহ্বরে আর অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে বাইরে। ছটফট করছে তিমিটা অসহায়ভাবে।

বললো বনহুর–মনিরা, খুব আশ্চর্য লাগছে তোমার, তাই না?

হাঁ, এমন সব বিস্ময়কর দৃশ্য আমি কোনোদিন দেখিনি।

যদি সর্পরাজ তিমি খাওয়ায় ব্যস্ত না থাকতো তাহলে আমাদের জাহাজখানাকে ডুবন্ত কোনো জীব মনে করে আক্রমণ করতে।

উঃ! কি ভয়ংকর দৃশ্য! বললো মনিরা।

বনহুর বললো——আরও ভয়ংকর দেখবার জন্য প্রস্তুত থাকো

তুমি আছো তাই সব ভয় আর ভয়ংকরকে জয় করবো।

মনিরা, তুমি বিশ্রাম ক্যাবিনে বিশ্রাম করবে যাও। ইঞ্জিন ক্যাবিনে যাবো। ডুবন্ত পর্বতের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। চালক ঠিকমত কাজ করতে না পারলে ডুবন্ত পর্বতমালার ধাক্কা খেয়ে সমুলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবো।

না, তোমাকে ছেড়ে যাবো না আমি। মনিরা বনহুরের একটি হাতের মুঠায় চেপে ধরে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে-পাগলামি করোনা মনিরা। চলো আমি তোমাকে বিশ্রাম ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অগত্যা মনিরা স্বামীর সঙ্গে পা বাড়ালো।

*

সর্দার।

বলো রহমান? বনহুর নিজে ডুবু জাহাজখানার হ্যান্ডেল চেপে ধরে জবাব দিলো।

বনহুরের পাশে দাঁড়িয়ে ডুবুজাহাজের সুদক্ষ চালক জন। মাহবুব এবং রহমানও দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে বাইনোকুলার, তারা সামনের পুরু গ্লাসের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে লক্ষ করছে।

ডুবু জাহাজখানা চালানোর দায়িত্বভার এ মুহূর্তে বনহুর স্বয়ং হাতে নিয়েছে। কারণ একটু এদিক ওদিক হলে ডুবন্ত পর্বতমালার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটতে পারে এবং সমূলে ধ্বংস হতে পারে।

বনহুর নিজে জাহাজখানাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে, তার লক্ষ্য ডুবন্ত পর্বতমালার কাছাকাছি এসে তার ডুবুজাহাজ খানাকে থামিয়ে ফেলবে। রহমান বললো—সর্দার, আমাদের ডুবুজাহাজখানা প্রায় ডুবন্ত পর্বতমালার কাছাকাছি এসেছি।

রহমান, তুমি পর্বতমালার দিকে লক্ষ রাখবে আর মাহবুব লক্ষ্য রাখবে চারপাশে। কোনো ভয়ংকর জলজীব আমাদের জাহাজখানাকে আক্রমণ করে না বসে।

সর্দার, আপনার আদেশমত কাজ করছি আমরা। বললো রহমান।

জন সর্বদা সর্দারের সহায়তায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ডুবন্ত জাহাজখানা গ্যাস দ্বারা চালিত, তাই জ্বালানি গ্যাস ঠিকমত পাইপ দিয়ে ইঞ্জিনে প্রবেশ করছে কিনা লক্ষ রাখছিলো জন।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, একসময় ডুবু জাহাজখানা এসে ডুবন্ত পর্বতটার পাসে এসে থামলো।

বনহুর এবার মনিরার ক্যাবিনে প্রবেশ করে বললো–বড্ড ভয় পেয়ে গেছে, তাইনা?

মনিরা সত্যি ভীত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো। বহু সময় বনহুর ইঞ্জিন ক্যাবিনে থেকে সে নিজে ডুবু জাহাজখানাকে চালনা করছিলো। ডুবন্ত পর্বতমালার সঙ্গে ধাক্কা খেলে জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেই কারণেই বনহুর স্বয়ং জাহাজখানা অতি সাবধানে পর্বতমালার ছোট ঘোট ডুবন্ত শৃঙঙ্গলো এড়িয়ে বৃহৎ আকার, পর্বতমালার পাশে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

স্বামীর সমস্ত দেহ ঘামে চুপসে উঠেছে। মুখমন্ডল লাল হয়ে ওঠেছে। হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মোছে বনহুর।

মনিরা বনহুরের শয্যায় বসিয়ে আঁচলে তার মুখন্ডলের ঘাম মুছে দিয়ে বলে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো! ইঞ্জিন ক্যাবিনে যা গরম। তাছাড়া গভীর পানির তলদেশে।

বনহুর অর্ধশায়িত অবস্থায় একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো তারপর একমুখ ধোয়া ত্যাগ করে বললো–মনিরা, জানো আমরা এখন এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখানে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে।

সত্যি আমার বড্ড ভয় করছে।

হেসে বললো বনহুর—তুমি না বলছে আমি পাশে থাকলে মৃত্যুকেও ভয় পাও না।

হাঁ তা সত্যি। ভয় আমার নিজের জন্য নয়…

তবে কার জন্য?

তোমার, ওগো তোমার জন্য।

আমি তো বলেছি মনিরা, মৃত্যুকে ভয় পাই না আমি। ভয়ংকরের সঙ্গেই তো আমার মোকাবেলা।

কি জানি তোমার সবই বিস্ময়কর জীবনে যা কল্পনাও করিনি তাই দেখছি। দেখছি তুমি যেমন বিস্ময়, তেমনি বিস্ময় তোমার সবকিছু! এমনভাবে তুমি গভীর সাগরতলে বিচরণ করে ফিরছে যা কেউ কল্পনা করতেও পারে না।

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো এমন সময় মাহবুব ছুটে এলোসর্দার, একটা বিরাট আকার কচ্ছপ আমাদের ডুবুজাহাজের সামনে এসে জাহাজখানাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে।

কচ্ছপ!

হ্যাঁ সর্দার। আপনি দেখবেন আসুন।

মনিরা ভীতকণ্ঠে বললো—আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। দেখবো কত বড় কচ্ছপটা আর কেমন করে সে তোমার জাহাজটার ওপরে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করছে?

এসো তাহলে। বনহুর মনিরাসহ মকবুলকে অনুসরণ করলো।

ডুবু জাহাজের সামনে ভাগে এসে দাঁড়িয়ে তাকালো বনহুর এবং মনিরা।

রহমান বলরো–সর্দার, এতোবড় কচ্ছপ আমি কোনোদিন দেখিনি। আশ্চর্য এই জলজীবটা।

বনহুর আর মনিরা পুরুগ্লাসের মধ্য দিয়ে সামনে ডুবন্ত পর্বতমালার দিকে তাকালো। উভয়ে অবাক হলো, মনে হচ্ছে একটি ছোটখাটো পাহাড় তাদের ডুবু জাহাজের দিকে চার পায়ে ভর করে এগিয়ে আসছে। কি ভয়ংকর তার চোখ দুটো।

রহমান বললো—সর্দার, ভুবন্ত পর্বতমালার গহ্বরে নানা ধরনের ভয়াবহ জীব বাস করে…এ কচ্ছপটি তাদের একজন।

বনহুর কচ্ছপটার দিকে লক্ষ রেখে বললো–রহমান, সেই ডুবন্ত পর্বত যে পর্বতের কাছাকাছি কোনো জাহাজ আজও পৌঁছতে পারেনি, এই পর্বতের অভ্যন্তরে একটি ভয়ংকর জীব বাস করে।

হাঁ সর্দার, আমিও ঐ রকম শুনেছিলাম। তবে কি আমরা ...সর্দার আমরা কি...রহমান যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

বললো বনহুর—আমাদের ডুবুজাহাজখানা মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

সর্দার।

হাঁ রহমান।

সর্দার, আমাদের তাহলে রক্ষা নেই। সেই ভয়াবহ জীবটার সঙ্গী এরা...

কচ্ছপটা ততক্ষণে আরও এগিয়ে এসেছে।

কি ভয়ংকর তার চোখ দুটো।

কচ্ছপটা ডুবুজাহাজটাকে একটা জলজীব মনে করেছে এবং সে কারণেই মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে ডুবুজাহাজটার দিকে।

মনিরা ভীত আতঙ্কিতভাবে সরে এলো পেছন দিকে।

রহমান বললো—বৌরাণী, কোনো ভয় নেই। কচ্ছপটা আমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কামান দিয়ে ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো এক্ষুণি।

বনহুর বললো–রহমান, দরকার নেই ওর জীবন নাশ করার। বরং আমাদের জাহাজখানা সরিয়ে নেই আরও কিছুটা দূরে!

সর্দার, নতুন কোনো বিপদ আসতে পারে। আমার মনে হয় এখানে আমাদের মোটেই বিলম্ব করা উচিত নয়।

হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো রহমান।

মনিরাও বললো—তুমি ফিরে চলো আমার কিছু ভাল লাগছে না।

বনহুর বললো—-ভয় পেও না মনিরা, আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন। রহমান, আমি ইঞ্জিন ক্যাবিনে যাচ্ছি তুমি মনিরাকে বিশ্রাম ক্যাবিনে রেখে এসো।

মনিরা কিছু বলবার পূর্বেই বনহুর চলে গেলো সেখান থেকে ডুবুজাহাজের ইঞ্জিন ক্যাবিনের দিকে।

রহমান বললো–আসুন বৌরাণী।

মনিরা অগত্যা রহমানকে অনুসরণ করলো।

*

মিঃ বি, কে চৌধুরী মুখখানা রাগে কুৎসিত আকার ধারণ করে, দাঁতে দাঁত পিষে বলে একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার আমি পরাজিত হলাম। বনহুরকে প্রয়োজন আছে আমার। তাকে আটক করার জন্য আমি আমার যথাসর্ব বিনষ্ট করেছি। পারলাম না ওকে বন্দী করে রাখতে।

মিঃ চৌধুরী, আমি আগেই বলেছিলাম তাকে বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলুন।

সোলিহ লোরী, তুমি একটা গাধার চেয়েও বুদ্ধিহীন। সুদীর্ঘ সময় আমার সঙ্গে কাজ করেও তুমি আজও এমন এক একটা কথা বলো যা মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়। বনহুরকে হত্যা করলে আমার গোপন বাসনা চরিতার্থ হবে না। আমি বনহুরের দ্বারা কোনো একটা কাজ যা কারো পক্ষে সম্ভব নয় আমি তাই করাতে চাই। তার স্ত্রীকে আটক করার মূল উদ্দেশ্য তাকে জীবন্ত আটক করা এবং তার স্ত্রীসহ তাকে সমুদ্র গহরে গুপ্ত বন্দীশালায় বন্দী করে রাখার পেছনেও ঐ একই উদ্দেশ্য। জানতাম বনহুরকে কোনো সুন্দরী মোহগ্রস্ত করতে পারবে না, তাই তার সহধর্মিণীকে আমি তার পাশে দিয়েছিলাম। সে যেন বাইরের জগতে বেরিয়ে আসার জন্য উন্মাদ না হয়।

তবুও তো…

হাঁ পারলাম না তাকে ধরে রাখতে।

সালিহ লোরী বললো—আমার মনে হয় সাগরতলে আমাদের ডুবন্ত পাহাড়ের গোপন বন্দীশালা বিনষ্ট হবার সময় তার ও তার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে।

এ কখনও আমি বিশ্বাস করি না, কারণ অত্যন্ত চতুর বনহুর। সে কেমন করে আমার এই দুর্গম বন্দীশালা বিনষ্ট, বিধ্বস্ত করলো আমি তা ভেবে পাচ্ছি না। ভাগ্যিস আমার ক্ষুদে সাবমেরিনটা সরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম নাহলে….

বললো মিঃ চৌধুরীর অপর একজন সঙ্গী–ঐ সাবমেরিনটা সরিয়ে না আনলে আমাদের ভীষণ ক্ষতি সাধন হতো।

আর একজন বললো—এমন কি ক্ষতি হতো! আমাদের সাগরতলে বন্দী গুহা বিনষ্ট হওয়ায় সে ক্ষতি হয়েছে আর তুলনায় একটি সাবমেরিন কিছু না। আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি বনহুর আর তার স্ত্রীর অন্তর্ধান।

একপাশে বসেছিলো মিঃ চৌধুরীর এক তরুণ অনুচর। সে কথা বলতে পারতো না বোবা। কানেও শুনতো না, কিন্তু তার দেহশক্তি ছিলো অসীম। এ কারণেই মিঃ চৌধুরী বন্ধু সোলিহ লোরীর অনুরোধে তাকে তার গোপন আসরে স্থান দিয়েছে। নাম মোরিও শান্ত এবং বোকাও কিছুটা। কোনো কথা সে বলে না, বলতেও পারে না। শুধু কাজ, যে কাজে তাকে লাগানো হয় সেই কাজ সে মনোযোগ দিয়ে করে।

শেষ কথাটা শুনে চমকে উঠলো মোরিও।

কেউ তা লক্ষ করলো না, কারণ তখন তারা নিজেদের গোপন আলোচনায় বিভোর।

মিঃ বি কে, চৌধুরী পায়চারী করতে শুরু করলো।

এতো বড় ক্ষতি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না। সব ক্ষতি মিঃ চৌধুরী মেনে নিতে পারেন কিন্তু এমন কোনো ক্ষতি হোক যা তার জীবনকে দূর্বিষহ করে তুলবে। বনহুর তার জীবনের প্রধান শত্রু। মিঃ চৌধুরী তার প্রধান পার্টনার আহসান হাবীবকে পৃথিবী থেকে সরিয়েছে। এখন যারা তার সঙ্গী তারা তার অনুগত দাসের মত। সে একা….

কি ভাবছেন? সোলিহ লোরী বললো।

মিঃ চৌধুরী বললো—আমার অসাধ্য কিছু নেই। আহসান হাবীব হত্যা ব্যাপার নিয়ে পুলিশমহল এখন নানা ধরনের গোয়েন্দা মহলের সাহায্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়নি, হবেও না কোনোদিন। পুলিশমহল মনে করছে আহসান হাবীবকে হত্যা করেছে বা এ হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে মাদামবাঈ ও তার পার্টনার রীনা নাগ।

সোলিহ লোরী বললো—তাহলে পুলিশমহলের ধারণা কি সম্পূর্ণ ভুল?

তোমাকে কি এমনিই বলি তুমি গাধা। নির্বোধ, মাদামবাঈকেও আমি এনেছিলাম আহসান হাবীবের জলসায় কিন্তু সুচতুরা মাদামবাঈ কৌশলে সরে পড়েছিলেন। নইলে আমি তাকেই পুলিশের হাতে তুলে দিতাম কৌশলে। কিন্তু...

সে সুযোগ মাদামবাঈ দেয়নি আপনাকে। আমার মনে হয় মাদামবাঈ আপনার পরিকল্পনা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েই সরে পড়েছিলো। আমরা কিন্তু সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে থেকেও আপনার অনেক কিছুই জানি না।

তোমাদের ছাড়া আমি কিইবা করেছি। সব তত তোমাদের নিয়েই করি। একলাখ টন শিশুখাদ্য পাচার করার সঙ্গে তোমরা কি ছিলে না?

ছিলাম। আমরা সকলে আপনার হিতৈষী এবং সহকারী। জনাব আহসান হাবীব নিহত হওয়ায় আমরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছি...

ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। একরাজ্যে দুই রাজা থাকতে পারে না। আমি আহসান হাবীবকে সরিয়ে দিয়েছি স্বহস্তে। কৌশলে, কেউ আজও জানে না...

সোলিহ লোর বলে উঠলো–আপনি দক্ষ আর নিখুঁতভাবে কাজ করেছেন। পুলিশবাহিনী খুঁজে ফিরলেও তারা আপনাকে সন্দেহ করবে না।

হাঁ, এ কথা সত্য বলেছো সোলিহ লোরী। আহসান হাবীবকে কৌশলে সারিয়েছি! অচিরেই সরাবো প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ নূরুজ্জামান। তারপর আমি মরিয়া হয়ে লাগবো বনহুরের সন্ধানে। এবার জীবিত নয়, তার মৃতদেহ আমি মমি করে রাখবো আমার নিজস্ব মিউজিয়ামে।

কিন্তু সে সুযোগ আপনি পাবেন না মিঃ বি, কে চৌধুরী......মোরিও দু'হাতে দু'খানা পিস্তল বের করে উদ্যত করে ধরলো বি, কে চৌধুরীর বুকের দিকে।

কক্ষে যারা ছিলো সবাই হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। বোবা কালা বাকহীন মোরিও এমন সবাক হয়ে উঠলো কি করে! সকলেই যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন মোরিও ইংগিত করলো সোলিহ লোরীর দিকে।

সোলিহ লোরী বাঁশীতে ফুঁ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সেই গোপন আড্ডাখানায় এক ঝাক পুলিশবাহিনী উদ্যত রাইফেল হাতে প্রবেশ করলো।

মোরিও গম্ভীর স্বরে বললো—-এই গুপ্ত আসরের একজনও যেন পালাতে না পারে। সবার হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিন ইন্সপেক্টার মিঃ আহমদ। মিঃ বি, কে চৌধুরী তাকালেন সোলিহ লোরর দিকে, সুদীর্ঘ সময় ধরে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আহমদ সোলিহ লোরর অভিনয় করে এসেছেন তাহলে দু'চোখে তার বিস্ময়।

পুলিশমহল এক এক করে সবার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছে।

মিঃ বি, কে, চৌধুরী দ্রুত ওদিকের দেয়ালের দিকে ছুটে দিয়ে যেমন একটা সুইচে হাত দিবেন ঠিক সেই মুহর্তে মোরিওর পিস্তল গর্জে উঠলো।

তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়লেন স্বনামধন্য জনদরদী নেতা মিঃ বি, কে, চৌধুরী তারই গুপ্ত আড়ডাখানার মেঝেতে। মোরিও গুলিটা ঠিক তার বক্ষভেদ করে দেয়ালে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে।

সোলিহ লোরর বেশী মিঃ আহমদ বললেন–মিঃ নূর, আপনার গুলীটি যদি আর এক সেকেন্ডে বিলম্ব করতো, তাহলে মিঃ বি, কে, চৌধুরী আবার অদৃশ্য হয়ে যেতো…

মোরিওবেশী নূর বললো—শুধু বি, কে, চৌধুরীই অদৃশ্য হতো না মিঃ আহমদ, আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতো যেখানে কেউ আর আপনাকে আর আমাকে খুঁজে পেতো না আর সেই কারণেই আমি তার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছি।

ততক্ষণে মিঃ বি, কে, চৌধুরীর সঙ্গীদের সবার হাতে হাতকড়া পড়েছে।

একটিও পালাতে সক্ষম হলো না।

ফিরে তাকালো নূর মিঃ বি, কে চৌধুরীর দিকে, এই লোকটি সাধুতার মুখোস পরে শুধু দেশ ও দেশবাসীর সর্বনাশ করেনি, তার মাকে উধাও করেছিলো, তবে তার কথায় নূর মনে মনে আশ্বস্ত হয়েছে, তার স্বামীর পাশেই তিনি এখন আছেন।

মিঃ আহমদ মিঃ নূরের করমর্দন করে বললো—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি নিপুণতার সঙ্গে কাজ করে জয়ী হয়েছেন।

শান্তগম্ভীর স্বরে বললো নূর—ধন্যবাদ!

*

বনহুর আর রহমান ইঞ্জিন ক্যাবিনের মোটা শাশী দিয়ে তাকিয়ে আছে সামনে। গভীর সমুদ্রতলে তাকিয়ে দেখছে তারা, তাদের ডুবুজাহাজখানা ডুবন্ত পর্বতমালা অতিক্রম করে বেরিয়ে এসেছে। কোনো ভয়ংকর জীবের সন্ধান তারা পায়নি।

বনহুর নিজে জাহাজখানা করে সুকৌশলে ডুবন্ত পর্বতমালা অতিক্রম করেছে। সমস্ত দিন এবং রাত বনহুরকে ইঞ্জিন ক্যাবিনে অবস্থান করতে হয়েছে। এখন সামনে তেমন কোনো বাধা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

বনহুর বললো–রহমান জানো, আমাদের জাহাজ এমন এক দ্বীপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যে দ্বীপ, যে দ্বীপে কোনোদিন কোনো জাহাজে গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। সেই মাথুন দ্বীপের দিকে আমরা চলেছি। শুনেছি সে দ্বীপে কোনো মানুষ বা জীবজন্তুও নেই। শুধু সোনা আর সোনা ছড়িয়ে আছে।

হাঁ সর্দার, আমিও শুনেছি। বিস্ময়কর সে দ্বীপ। কেউ কোনোদিন সে দ্বীপে পৌঁছানো দূরের কথা, কোনো জাহাজ এদিক দিয়ে যেতে পারে না। সর্দার, একটা ভয়ংকর জলজীব বিরাট বিরাট জাহাজকে থাবা দিয়ে তলিয়ে দেয়। এবং চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলে।

কিন্তু আশ্চর্য এমন কোনো ভয়ংকর জীবের সন্ধান পেলাম না যে আমাদের জাহাজখানা চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলতে পারে। তবে হাঁ, কিছু জীবন ঝরে পড়ছে সেগুলোও কম ভয়ংকর নয়। সামুদ্রিক জীবগুলো ভয়ংকরই বটে। দেখলে না বিরাট আকার কচ্ছপটার চেহারা, তারপর ভীষণ আকার সর্পরাজ, এরাও কম ভয়ঙকর নয়। এ ছাড়াও অক্টোপাশগুলো আমাদের জাহাজখানাকে আক্রমণ করার জন্য কেমন করছিলো।

সর্দার, না জানি সে জীবটা তাহলে কত বড় এবং কত ভয়ংকর…

এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ালো মনিরা, বললো সে–কাল থেকে তুমি ইঞ্জিন ক্যাবিনে রয়েছে, কেন জন তো ভাল চালক?

হাঁ, জন ভাল চালক এ কথা সত্য, অভিজ্ঞও বটে।

বললো রহমান——বৌরাণী, আপনি আছেন আমাদের জাহাজে তাই সর্দার কারও হাতে জাহাজ চালনার দায়িত্ব দিতে ইচ্ছুক নন, বিশেষ করে ডুবন্ত পর্বতমালা অতিক্রম করার সময় সর্দার নিজে অতি সাবধানতার সঙ্গে জাহাজ চালনা করে এসেছেন। বহু ডুবন্ত শৃঙ্গ ছিলো, যদি কোনো ক্রমে একটি ডুবন্ত শৃঙ্গের সঙ্গে আমাদের ডুবু জাহাজের তলা ঘর্ষণ লাগতে তাহলে সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতে আমাদের ডুবু জাহাজখানা। এ কারণেই সর্দার নিজে…

বনহুর হেসে বললো–বড় ঘাবড়ে গেছে মনিরা! জানো আমরা এখন এমন এক দ্বীপের দিকে অগ্রসর হচ্ছি যে দ্বীপে কোনো সময় কোনো মানুষ পৌঁছতে পারেনি।

মনিরা বললো—জানি না তুমি কোথায় চলেছো? জানি না কোন সে দ্বীপ? চলো বিশ্রাম করবে চলো। ইঞ্জিনের ধোয়া আর গরমে তোমার চেহারা কি হয়েছে।

সর্দার, আপনি যান। আমি আছি জনের পাশে। তাছাড়া মাহবুব, মরিং রুসো এরাও আছে।

বনহুর বললো—চলো মনিরা।

*

স্বামীসহ ফিরে এলো মনিরা ডুবু জাহাজের বিশ্রাম ক্যাবিনে।

স্বামীর হাত ধরে বসিয়ে দিলো সে তাকে বিছানার একপাশে! আঁচলে ওর ললাটের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে বললোতোমার দেহ কি লোহা দিয়ে তৈরি তোমার এতোটুকু ক্লান্তি-অবসাদ

না। না মনিরা। ক্লান্তি অবসাদ আজও আমাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাছাড়া তুমি তো আমাকে কোনো সময় অবসাদগ্রস্ত দেখতে চাওনি মনিরা?

হাঁ, চাই না তাই বলে তুমি.

থাক অনেক বলেছো, আর নয়! বনহুর মনিরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। তারপর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললোমনিরা, এমন করে তোমাকে পাবো এ যে আমার কল্পনার অতীত। এখন আমরা খুব সুখী, তাইনা?

মোটেই তুমি সুখী নও, আমি সুখী। কারণ তোমাকে পাশে পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যদিও একটা ভয় সর্বক্ষণ আমাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

তুমি মিছামিছি আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছে মনিরা।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখলো।

*

রাতদিন একটানা চলার পর ডুবু জাহাজখানা মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো।

রহমান এসে জানালে তারা আজকেই মাথুনকে অবতরণ করতে সক্ষম হবে।

ক্যাপটেন আরফিন হুইয়ের জাহাজ যে পাশে অবস্থান করছিলো তার অপর পাশে বনহুরের ডুবু জাহাজখানা এসে থামলো। গভীর জলের তলদেশে। বনহুর এবং তার সঙ্গীদের ধারণা এ দ্বীপে আজও কোনো মানুষ পদার্পণ করে নি।

বনহুর রহমানকে নির্দেশ দিলো ডুবু জাহাজখানাকে সমুদ্র তলদেশ হতে কিছুটা উপরে তুলে নেওয়ার জন্য। টেলিভিশন ক্যামেরা চালু করে দেওয়া হলো।

বনহুর এসে বললো টেলিভিশন পর্দার সামনে।

মাথুন দ্বীপের সমস্ত অংশ ক্যামেরায় ধরা না পড়লেও কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। বনহুর আনন্দধ্বনি করে উঠলো, রহমান দেখো দেখো মাথুন দ্বীপের উঁচু নীচু টিলাগুলো স্বর্ণকণিকা দ্বারা ভরে রয়েছে। উজ্জলতারকা খচিত মনে হচ্ছে মাথুন দ্বীপের স্তরগুলো…

হাঁ সর্দার। বললো রহমান।

সকলের দৃষ্টি টেলিভিশন পর্দায়।

এমন কি মনিরাও আছে সেখানে। সকলেরই চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস।

মাহবুব বলে ওঠে-সর্দার, বহু দ্বীপ আমরা দেখেছি কিন্তু এমন মনি মানিক-খচিত স্বর্ণদ্বীপ আমরা দেখিনি।

রহমান বললো–বিলম্ব না করে নেমেপড়া সমচীন সর্দার।

হাঁ, আমারও তাই মনে হয়। বললো বনহুর।

ডুবুজাহাজখানাকে আরও কিছুটা এগিয়ে নেওয়া হলো।

এবার সাবমেরিন ধরনের ছোট ছোট কয়েকটি জলযান বের করে নেওয়া হলো ডুবু জাহাজ থেকে। তারপর সবাই মিলে এসে হাজির হলো মাথুন দ্বীপে।

বনহুর আর মনিরা একটি যানে।

মাটিতে পা রেখে আনন্দে আত্মহারা হলো মনিরা। দু'হাতে স্বামীর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো—উঃ! কি সুন্দর! মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে-সোনালী সূর্যের আলো আমার বড় ভাল লাগছে...

সত্যি মনিরা, আমারও খুব ভাল লাগছে। বললো বনহুর।

মনিরা হেসে বললো—তোমার আবার বোধশক্তি আছে নাকি?

তুমি আমাকে একটি পাথরের সঙ্গে তুলনা করছো মনিরা?

হাঁ, কতকটা তাই। তোমার মধ্যে যদি প্রাণ থাকতো, তোমার যদি বোধ শক্তি থাকতো তাহলে তুমি অমন পাষাণের মত....

মনিরার কথা শেষ হয় না, রহমান আর মাহবুব মুঠায় বালু আর মাটি নিয়ে এগিয়ে এসে ব্যস্তকণ্ঠে বলে–সর্দার, দেখুন মাটি আর বালুর সঙ্গে সোনা!

এতোক্ষণ বনহুর আর মনিরা অন্যমনস্ক ছিলো, এবার তারা মাহবুব আর রহমানের হাতের মুঠার বালু মাটির দিকে তাকালো। সত্যি বিস্মিত হলো বনহুর

আর মনিরা। তারা পায়ের তলায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আনন্দধ্বনি করে উঠলো! অদ্ভুত আর সুন্দর এই মাটি। মাথুন দ্বীপ সবার চোখে রাশি রাশি বিস্ময় ছড়িয়ে দেয়।

মনিরা দু'হাতে সোনা মেশানো মাটি তুলে নিয়ে আঁচলে রাখছে। আরও নিচ্ছে সে আঁচলভরে।

বনহুর হেসে বললো—কত নেবে মনিরা? এ দ্বীপের সমস্ত মাটিতে সোনা আর সোনা ছড়িয়ে আছে, দেখছোনা কত সোনা ছড়িয়ে আছে মাটির সঙ্গে।

রহমান, মাহবুব আর যারা তাদের সঙ্গে এসেছিলো সবাই মুগ্ধ অভিভূত এতো সোনা চারদিকে, চোখ ধাধিয়ে যায়।

বনহুর, মনিরা, রহমান ও সঙ্গীরা সবাই এগিয়ে চললো।

সর্বাগ্রে বনহুর স্বয়ং।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বললো বনহুর–একেবারে জন প্রাণীহীন মাথুনদ্বীপ। চারদিকে একটি প্রাণীও নেই; কোনো জীবের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

সর্দার, এ কথা আমরা শুনেছিলাম কিন্তু এবার চাক্ষুষ দেখছি, মাথুন দ্বীপ জনপ্রাণীহীন।

হঠাৎ একজন ছুটে এলোসর্দার, ঐখানে একটি সিগারেটের টুকরা পেলাম! এই দেখুন সর্দার! এই দেখুন...

বনহুর সিগারেটের টুকরাটা হাতে নিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো–হাঁ, আমাদের পূর্বে কোনো মানুষ এখানে পদার্পণ করেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তারা কারা?

বনহুরের গলার স্বর গম্ভীর শোনালো।

আবার এরা এগুতে লাগলো।

বেশ কিছুটা এগুনোর পর অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলো রহমান–সর্দার মানুষের কংকাল...ঐ দেখুন সর্দার...

সবাই একযোগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সামনে একটা ঝোঁপের পাশে পড়ে আছে একটি মানুষের কংকাল।

মনিরা বনহুরের জামাটা চেপেধরে ভীতভাবে বলে উঠলো—না না, আর এগুবে না। ফিরে চলল, ফিরে চল তুমি…

বনহুর মনিরার কথায় কান না দিয়ে বললোজনহীন দ্বীপে মনুষ্য কংকাল, আশ্চর্য বটে…

[পরবর্তী বই বিস্ময়কর গুহা]

পূর্ববর্তী:

« ৮.০৫ দুর্ধর্ষ জাভেদ

পরবর্তী:

৮.০৭ বিস্ময়কর গুহা »